রাজাবদল

রাজাবদল

বিমল মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

Rājā Badal
A novel
Price Rs. 7.00

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ ১৩৭৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৭৭
তৃতীয় মুদ্রণ : পৌষ ১৩৭৯

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী

উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে, গত কয়েক বছর যাবৎ অসংখ্য উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ও-নামে কোনও লেখক সত্যিই আছে কিনা ঈশ্বর জানেন। তিনি যদি সত্যিই সশরীরে বিরাজ করেন তো লোক-সমাজে হাজির হয়ে তাঁর সোৎসাহে তা ঘোষণা করা উচিত। যা'হোক, আপাততঃ অপরের প্রশংসাও যেমন আমার প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়, অপরের নিন্দা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। অথচ প্রায় প্রত্যহই আমাকে সেই একই দায় বহন করতে হচ্ছে। পাঠক-পাঠিকা-বর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

বিমল মিত্র

লেখকের অন্যান্য বই :

বেগম মেরী বিশ্বাস
সাহেব বিবি গোলাম
কড়ি দিয়ে কিনলাম
একক দশক শতক
চলো কলকাতা
এর নাম সংসার
চার চোখের খেলা
কথাচরিতমানস
সাহেব বিবি গোলাম (নাটক)
একক দশক শতক (নাটক)
স্ত্রী
বিমল মিত্রের সাহিত্য বিচিত্রা
মিথুন লগ্ন
নফর সংকীর্তন
বেনারসী
শ্রেষ্ঠ গল্প
মন কেমন করে
অন্যরূপ
কন্যাপক্ষ
সরস্বতীয়া
বরনারী (জাবালি)
গুলমোহর
রানীসাহেবা
সখী সমাচার
গল্প সম্ভার
কাহিনী সপ্তক
এক রাজার ছয় রানী
প্রথম পুরুষ
মৃত্যুহীন প্রাণ
টক ঝাল মিষ্টি
পুতুল দিদি
মনে রইলো
দিনের পর দিন
বাহার
শনি রাজা রাহু মন্ত্রী
তোমরা দু'জনে মিলে
তিন ছয় নয়
নিবেদন ইতি
রং বদলায়
সুয়োরানী
রাজপুতানী
নবাবী আমল
কলকাতা থেকে বলছি
প্রেম পরিণয় ইত্যাদি
কুমারী ব্রত
ইত্যাদি

রাংতাবদল

তুমি যদি কখনও বলরামপুরে যাও তো আমি রাস্তা বলে দিতে পারি। এই শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে তোমাকে বাস ধরতে হবে। সব বাস বলরামপুরে যাবে না। কিন্তু দেখবে বাসের কনডাকটাররা চিৎকার করছে—ইটিনডা ঘাট, ইটিনডা ঘাট—।

আবার কেউ চিৎকার করছে—বারাসাত, বসিরহাট, টাকী—

কিন্তু আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখবে, এক জায়গায় রাস্তার ফুটপাত ঘেঁষে আরো অনেকগুলো বাসের ভিড়। সেখানেও লোক-জন, মেয়ে-পুরুষ, ফেরিওয়ালা, মোটঘাটের ভিড়। বাসের মাথায় ভুল ইংরিজীতে লেখা আছে বলরামপুর। বাসের চেহারা দেখলেই বোঝা যাবে সেগুলো যাবে বলরামপুরে। মাথাপিছু টিকিট বারো আনা। তা বারো আনার টিকিট নিয়ে তোমাকে একেবারে বলরাম-পুরের গঞ্জে তারা পৌঁছিয়ে দেবে। গঞ্জের ওপর পৌঁছে দেখবে সামনে মথুর সা'র বিরাট দোকান। দোকানের মাথার ওপর এখনও সেই আগেকার সাইনবোর্ডটা টাঙানো আছে। সাইন-বোর্ডের ওপরে বড় বড় রং-চঙে অক্ষরে লেখা—'বলরামপুর ভ্যারাইটি স্টোর্স, প্রোঃ মথুর সাহা। বলরামপুর।' সে-দোকানে সাবান, তেল, ডাল থেকে শুরু করে, পান, সুপুরি খয়ের পর্যন্ত পাবে। এমন কি হ্যারিকেন লণ্ঠন, টর্চবাতি, ব্যাটারি, কব্জা, পেরেক পর্যন্ত সব পাবে।

আর তার ওপরেই ইছামতী। ইছামতী নদী ওখানে চওড়া হয়ে গিয়েছে অনেকখানি। এপার-ওপার করবার ফেরি নৌকো আছে। নৌকোর ওপর উঠে যদি ওপারে যাও তো তোমার

হয়তো ভয় করবে। ভয় করবে ডুবে যাবার। ষাট-সত্তরজন যাত্রী নিয়ে মাঝিরা দাঁড় বেয়ে বেয়ে এপার-ওপার করে। যাত্রী নয় শুধু, সঙ্গে তাদের মালপত্রও থাকে। এপারের মথুর সা'র ভ্যারাইটি স্টোর্স থেকে মালপত্র কিনে তারা ওপারের দোকানে গিয়ে খুচরো দরে সেগুলো বেচে।

তা সাড়ে দশটার বাসে যদি ওখানে গিয়ে পৌঁছোও তো দেখবে তখন 'বলরামপুর হাই স্কুলে'র ঘণ্টাটা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ঢং ঢং করে বাজছে। এক মিনিট এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। গৌর ভট্টাচার্যির সেদিকে কড়া নজর; তারপর ঠিক গঞ্জটার সামনে দিয়ে পুব দিক বরাবর চলে যাও। চওড়া ইঁট বাঁধানো রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে বাগানওয়ালা কয়েকটা বাড়ি। পাঁচখানা বাড়ি পেরিয়ে যাবার পর বাঁদিকে চাইবে। দেখবে সামনে উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা মাঠ। আর রাস্তার দিকে কোনাকুনি জায়গাটায় লোহার শিক লাগানো বিরাট একটা গেট। সেই গেটের মাথায় একটা মস্ত বড় বোর্ড লাগানো। বোর্ডের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'বলরামপুর হাই স্কুল'।

গেটের পাশেই বুড়ো মালী জনার্দন দাঁড়িয়ে থাকে।

তোমাকে দেখেই জনার্দন গেট খুলে দেবে। জিজ্ঞেস করবে—আপনি কোত্থেকে আসছেন?

তুমি বলবে—আমি পাবলিশার্সের দোকান থেকে আসছি—

—ইস্কুলে বই ধরাবেন তো?

তোমার হাতে বই-এর বাণ্ডিল দেখেই জনার্দন তোমার মতলব বুঝে নেবে। আদ্যিকাল থেকে সে স্কুলের মালীর কাজ করে আসছে। প্রতি বছরে সে এই পাবলিশার্সদের ক্যানভাসারদের দেখে আসছে। তারা বই ধরাবার জন্যে গাদা-গাদা বই নিয়ে আসে। তারপর যখন নতুন বছরের বুক-লিস্ট ছাপা হয়ে যায় তখন আর তাদের দেখা যায় না। এক বছরের মত আর তাদের দেখা পাওয়া যায় না এ-অঞ্চলে।

তা তুমি অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে—তুমি কী করে বুঝলে?

জনার্দন একটু হাসবে।

বলবে—আপনি যে হেডমাস্টারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। হেডমাস্টার তো ভবরঞ্জনবাবু। ভবরঞ্জনবাবু এ-সব তো দেখেন না। সব দেখেন আমাদের গৌর পণ্ডিতমশাই—

—গৌর পণ্ডিতমশাই? তিনি কে?

জনার্দন বলবে—ও, আপনি তাহলে নতুন লোক, তিনিই তো এ-ইস্কুলের সব মশাই। আপনি গৌর পণ্ডিতমশাই-এর নাম শোনেননি? আরে, তাহলে আর আপনার বই ধরবে না। তাঁরই তো ইস্কুল এটা—

তা জনার্দন মিথ্যে কথা বলেনি। যখন এই বলরামপুর স্কুল প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তখনকার লোক জনার্দন। তখন বলরামপুরে স্কুল-পাঠশালা-টোল কিছুই ছিল না। জনার্দনকে একদিন ডেকে চাকরি দিয়েছিল গৌর ভট্টাচার্যি মশাই।

জনার্দনের মনে আছে সে-সব কথা। একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভট্টাচার্যি মশাইকে দেখে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল জনার্দন।

—কে গো? কে তুমি?

—আজ্ঞে, আমি জনার্দন।

—ও। তা কেমন আছ বাবা তুমি?

জনার্দন বলেছিল—আজ্ঞে ভালো আর কই!

—কেন, ভালো নেই কেন বাবা? কী হয়েছে তোমার?

জনার্দন বলেছিল—আজ্ঞে সা' মশাই-এর আড়তের চাকরিটা আমার গেছে।

কথাটা শুনে ভট্টাচার্যি মশাই যেন থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—চাকরি গেছে? কেন গেল। তুমি কী দোষ করেছিলে গা?

—আজ্ঞে, দোষ আর করবো কী! দিন-কাল খারাপ, ব্যবসা-পত্তোর মন্দা, তাই চাকরি গেল।

এসব বলরামপুরের আদিযুগের কথা। তখনকার বলরামপুর এমন ছিল না। বাস চলতো না রাস্তায়। এখনকার মত ইলেকট্রিক লাইট জ্বলতো না। এমন পিচ-বাঁধানো রাস্তাও হয়নি তখন সদরে। এখনও বলরামপুর অজ গাঁ। কিন্তু সে বলরামপুর ছিল আরও অজ। না আছে একটা ইস্কুল, না আছে একটা পাঠশালা। কেউ সংস্কৃতই জানে না। সংস্কৃত কেউ পড়াতেই চায় না। ইংরিজী পড়তে চায়, ভূগোল পড়তে চায়, ইতিহাস পড়তে চায়। শুধু সংস্কৃতটা পড়তে চায় না।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তা তুমি চাকরি করবে ঠিক জনার্দন?

জনার্দন কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠেছিল। বলে উঠলো—চাকরির খোঁজ আছে নাকি আপনার কাছে? দেন না পণ্ডিত-মশাই, বড় উব্‌গার হয় আমার। যে-কোনও কাজ, যে-কোনও মাইনে। আমার একটা মাথা গোঁজবার ঘর হলেই হলো, আর কিছু চাইনে—

তা সেই থেকে জনার্দন চাকরি পেয়ে গেল এই বলরামপুর হাই ইস্কুলে। তখনও ইস্কুল হয়নি গৌর পণ্ডিতের। মনে মনে তখন সবে মতলব ভাঁজছে। এত বড় একটা গ্রাম, এত দোকান, এত বড় গঞ্জ, এত মানুষের আনাগোনা, এখানে একটা প্রাইমারি ইস্কুল কিংবা পাঠশালা করলে তো বেশ হয়!

জনার্দন বললে—কবে থেকে ইস্কুল আরম্ভ হবে পণ্ডিত মশাই?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—হবে হবে, শিগ্‌গিরই হবে, একটা জুতসই জমি পেলেই একটা পাঠশালা শুরু করে দেবো—

সেই জুতসই একটা জমি যোগাড় করতেই লেগে গেল দুটো বছর! জমি আর কে দেবে। জমি থাকলেই যে দিতে হবে এমন কোনও কথা নেই। পূর্বপুরুষদের পড়ে পাওয়া সম্পত্তি ভোগ-দখল করে আসছি, এমনি দান-ছত্তোর করলেই হলো?

মথুর সা' গঞ্জে আড়ত করে অনেক টাকা জমিয়েছিলেন। কাঁচা টাকার কারবার। টাকা-পয়সা গুনতে গুনতে ডান হাতের পাঁচটা আঙুলে তাঁর কড়া পড়ে গিয়েছিল।

বললে—কে, আপনি?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর বয়েস তখন কম। কিছুতেই দমেন না। উদয়াস্ত খেটে-খেটে টাকা যোগাড় করছেন। বলতে গেলে সকলকার কাছে ভিক্ষেই করছেন তখন।

বললেন—আমার নাম শ্রীগৌরপদ ভট্টাচার্যি, কাব্যতীর্থ, আমি এই বলরামপুরেই থাকি। দক্ষিণপাড়ায়—

—আপনি কতদিন আছেন বলরামপুরে?

—এই বছর খানেক হলো এসেছি।

—এখানে এখন কী করা হয়?

—ছাত্র পড়াই।

—মহাশয়ের নিবাস?

নানান রকম খবর নিলেন মথুর সা' মশাই। মথুর সা' তখনই বৃদ্ধ হয়েছেন। কত আয়, সংসারে কে-কে আছেন, ছেলেমেয়ে ক'টি তাও জেনে নিলেন।

বললেন—আপনি যে পাঠশালা করবেন, আপনার সংসার চলবে কী করে?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—আমার পাঠশালায় ছাত্রের অভাব হবে না সা' মশাই। আপনারা সবাই গণ্যমান্য মহাশয় ব্যক্তিরা আছেন। আপনাদের দয়া হলে পাঠশালা ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে।

তারপরে একটু থেমে বললেন—আমি নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান, উপবাস করা আমার অভ্যেস আছে। না-হয় একবেলা আহার করবো—

মথুর সা' মশাই হাসলেন। বললেন—তা আপনি পণ্ডিত-মানুষ, আপনি না-হয় উপোস করলেন, আপনার ব্রাহ্মণী? তিনি

কোন দুঃখে উপোস করতে যাবেন? তাঁর দিকটাও তো আপনাকে দেখতে হবে।

গৌর পণ্ডিত বললেন—সা' মশাই, শাস্ত্রে বলেছে—মৎকর্মকৃন্মৎ-পরমো মদ্ভক্ত সঙ্গবর্জিতঃ,···অর্থাৎ যিনি ভগবানের কর্ম করেন বা ঈশ্বরের জন্যে কর্ম করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য, কারো ওপর যার শত্রুতা নেই, তিনিই শুধু আমার দর্শন পান—

সা' মশাই এ-সব বোঝেন না। বেশ নতুন লাগলো কথাগুলো।

আগ্রহ করে পাশে বসতে বললেন। বললেন—আপনি এখানে বসুন, আমি গো-মুখ্যু মানুষ, টাকা-পয়সা পেলেই খুশী হই, তেজারতি ব্যবসা করি, অত সংস্কৃত-টংস্কৃত বুঝি না। একটু মানেটা বুঝিয়ে বলুন—

বেশ ভালো শ্রোতা পেয়ে গেছেন গৌর পণ্ডিতমশাই। বললেন—দেখুন সা' মশাই, আপনি আমি, আমরা সবাই মায়ামুগ্ধ জীব, আমরা বলি 'আমার সংসার, আমার কর্ম, আমার কর্তা,' এই সব বলি তো? আসলে আমরা জানি না আমরা নিমিত্তমাত্র। সব কর্মই পরমেশ্বরের কর্মের কারক, কারয়িতা সবই তিনি—

তবু মথুর সা' বুঝতে পারলেন না। বললেন—তার মানে? বেশ ভালো করে বুঝিয়ে বলুন তো, শুনি—

গৌর পণ্ডিত বললেন—আমার তো বলতে ভালোই লাগে সা'মশাই, কিন্তু···কিন্তু শোনাবার লোক পাই না কাউকে, এই আমার দুঃখ, কেউ সংস্কৃত জানে না। তবে শুনুন—

বলে গৌর পণ্ডিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করে দিলেন। ওদিকে খদ্দেররা তেল-নুন-মশলা-চাল-ডাল কিনতে এসেছে। তারা দেখলে একজন আধ-বুড়ো লোক গড়গড় করে সংস্কৃত বলছে আর তার ব্যাখ্যা করছে। আর তার সামনে দোকানের মালিক মথুর সা' মশাই ভক্তি-গদ্‌গদ হয়ে বসে আছেন।

একজন জিজ্ঞেস করলে দোকানীকে—ও কে হে গোরাচাঁদ?

গোরাচাঁদ দাঁড়িপাল্লা নিয়ে সওদা ওজন করতে করতে বললে —ও একজন পণ্ডিত—

—কী নাম ওঁর? নতুন এসেছেন বুঝি বলরামপুরে?

—দক্ষিণপাড়ায় বাসা ভাড়া নিয়েছেন, পাঠশালা করবার জন্যে এসেছেন।

ওদিকে গৌর পণ্ডিত তখন গড়গড় করে সংস্কৃত আওড়াচ্ছে আর তার ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে—নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ। অর্থাৎ কিনা মানুষ হলো নিমিত্তমাত্র, যিনি বৈদিক লৌকিক সমস্ত কর্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করে তাঁর ভৃত্যের মত তাঁরই কর্ম তাঁরই প্রীতির জন্যে সম্পন্ন করেন, তিনিই 'মৎকর্মকৃৎ—'। বুঝলেন সা' মশাই, শাস্ত্রে বলছে 'সঙ্গবর্জিত' হতে হবে, তার মানে আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ধরুন এই যদি আমি পাঠশালা করি এখানে তো আমাকে আসক্তিশূন্য হয়ে পাঠশালা করতে হবে। আমি যদি ভাবি যে, এই পাঠশালা করে সেই পয়সাতে আমি জীবিকা নির্বাহ করবো তাহলে···

খাওয়া-দাওয়া করতে দেরি হয়ে যাচ্ছিল গৌর পণ্ডিতমশাই-এর। জনার্দন পাশেই ছিল।

সে বললে—পণ্ডিত মশাই, অনেক দেরি হয়ে গেল, এবার উঠতে···

গৌর পণ্ডিত তখন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে করতে তন্ময় হয়ে গেছেন। হঠাৎ বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—তুই চুপ কর তো! তুই মুখ্যু মানুষ, তুই এর কী বুঝবি রে—

বলে আবার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন গৌর পণ্ডিত—সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ। অর্থাৎ কি না···

মথুর সা'মশাই অনেক মানুষ দেখেছেন, কিন্তু এমন মানুষ জীবনে দুটো দেখেননি। বহুকালের কারবার তাঁর। 'বলরামপুর ভ্যারাইটি স্টোর্স'-এর গোড়াপত্তন থেকে অনেক রকম খদ্দের এল গেল। অনেক লোক তাঁকে ঠকালো, আবার অনেক লোককে

তিনিও ঠকালেন। কিন্তু এই নতুন মানুষটাকে তিনি কী দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন কে জানে।

হঠাৎ কথার মাঝখানেই বললেন—পণ্ডিত মশাই, আপনার কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেল, আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো ?

—খাওয়া ? আহার ?

কথায় বাধা পেয়ে যেন বিরক্ত হলেন গৌর মাস্টার। বললেন —না না, আহারাদি এখন থাক, আপনার মত এমন বিচক্ষণ ব্যক্তি পাওয়া গেছে, এই দেখুন না, শাস্ত্রে বলছে, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা···

হঠাৎ কে বুঝি এসে পড়লো মথুর সা'মশাই-এর সামনে। তাঁকে দেখেই সা'মশাই বললেন—কেমন আছেন গোবিন্দবাবু, আসুন আসুন—

গোবিন্দবাবু বসলেন। বললেন—না, আমি আর বসবো না —সরষের তেল চাইছিলাম, বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে—এক টিন—

বলেই উঠে চলে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু পেছন থেকে ডাকলেন মথুর সা'মশাই। বললেন—ও গোবিন্দবাবু, এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ নেই, ইনি হচ্ছেন···

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিলেন। মথুর সা'ই বলে দিলেন—ইনি হলেন এখানকার ডিসটি্ক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী···

মথুর সা'মশাই-ই বলে দিলেন গৌর মাস্টারের উদ্দেশ্যটা। বললেন—ইনি একটা পাঠশালা করতে চান বলরামপুরে, পণ্ডিত মানুষ। আমাকে ধরেছেন জমি দেবার জন্যে···

কাজের মানুষ গোবিন্দ চক্রবর্তী মশাই। ডিসটি্ক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান। বললেন—তা বেশ তো, আপনি একবার সময়মত আমার সঙ্গে দেখা করবেন—

তা এমনি করে তখন সকলের সঙ্গেই দেখাশোনো করেছিলেন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই। সে-সব অনেক দিনের কথা। তখন এই বলরামপুর এ-রকম ছিল না। গৌর পণ্ডিতেরও তখন বয়েস কম ছিল। ওই জমিটা দিয়েছিলেন মথুর সা'মশাই। তাঁর বড় ভালো লেগেছিল পণ্ডিত মানুষটিকে। এই যে এত বড় স্কুলটা দেখছো, ওই সাত বিঘে জমিটা তখন আশ্যাওড়া আর কচু গাছের জঙ্গলে ভরা ছিল। আম, জাম, নারকেল গাছের জঙ্গল, সাপ-খোপের আড্ডা। তার সঙ্গে ছিল একটা ডোবা পুকুর। সব জমিটাই একদিন তিনি দানপত্র করে দিলেন ইস্কুলের নামে।

তুমি যখন ভেতরে যাবে তখন দেখবে সামনে বড় একটা মাঠ। ছেলেদের খেলবার জন্যে। সেটা পার হয়ে দেখবে গেটের দিকে হনহন করে আসছেন একজন বৃদ্ধমানুষ। হাফ-হাতা পাঞ্জাবী, খাটো ধুতি, পায়ে এক জোড়া বিদ্যাসাগরি চটি। কাঁধে চাদর। গলায় ঝোলানো একটা ঘড়ি।

—জনার্দন, জনার্দন, গেট বন্ধ করো, গেট বন্ধ করো—

জনার্দনও এখন বুড়ো হয়ে গেছে। পণ্ডিতমশাই-এর কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই জনার্দন লোহার গেটটা বন্ধ করে দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একপাল ছেলে স্কুলে ঢোকবার মুখে আটকা পড়ে গেল।

—এ্যাই, তোর দেরি হলো কেন রে? জানিস না, সাড়ে দশটার সময় ইস্কুল বসে?

—এ্যাই, তুই? তুই?

সবাই মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—বল্, দেরি হলো কেন? তুই? তুই?

একজন মুখ কাঁচুমাচু করে বললে—আমার মা'র অসুখ হয়েছিল স্যার, ভাত রাঁধতে পারেনি—

—আচ্ছা, ঠিক আছে, তুই ভেতরে আ!

জনার্দন গেটটা ফাঁক করতেই ছেলেটা ভেতরে ঢুকে পড়লো।

—আর তুই?

—আমি খামারে গিয়েছিলুম স্যার, বাবাকে ভাত দিতে—

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সবাইকে ঢুকতে দিলেন গৌর পণ্ডিত। কিন্তু সাবধান করে দিলেন, আর কখনও যেন কারো দেরি না হয়।

কিন্তু মুশকিল হলো অনিলেশের। অনিলেশ চ্যাটার্জি।

—তুমিও লেট অনিলেশ?

তারপর জনার্দনকে বললে—খোল জনার্দন, গেট খোল—

জনার্দন গেট খুলে দিলে। অনিলেশ লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ভেতরে ঢুকে সোজা স্কুল-বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। আত্মগোপন করতে পারলেই যেন সে বাঁচে।

পেছনে-পেছনে গৌর পণ্ডিত যাচ্ছিলেন। কাছাকাছি আসতেই বললেন—তোমরাই যদি লেট করে আস অনিলেশ, তা হলে ছাত্ররা কার আদর্শ অনুসরণ করবে বলো তো? কাদের কাছে শিখবে তারা? কে তাদের পথ দেখাবে?

অনিলেশ সত্যিই লজ্জায় পড়েছিল। গৌর মাস্টারের কথায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো।

বললে—পণ্ডিতমশাই, আপনি ঠিক আমাদের সমস্যাটা বুঝবেন না—

—বুঝবো না মানে? তুমি বলছো কী?

—না পণ্ডিতমশাই, আপনাকে বলা বৃথা। আপনি সেকালের মানুষ। আপনিই এককালে এই স্কুল তৈরি করেছেন, আমরা সব শুনেছি। কিন্তু আমরা এ-যুগে জন্মেছি, আমাদের এখন নানান সমস্যা! জানেন, আজকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল,

আপনাকে ভেতরের কথা খুলেই বলি, আজকে রেগেমেগে ভাতই রাঁধেনি আমার বউ···

বলতে বলতে একটু থেমে হঠাৎ অনিলেশ আবার বললে—আপনি তো আমায় বলছেন, আর ওদিকে ওই দেখুন তো, কে যাচ্ছে—

গৌর ভট্টাচার্যি মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন। অঙ্কের মাস্টার শশধরবাবু লুকিয়ে সিঁড়ির তলা দিয়ে অফিস-ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে—

—আমার বেলাতেই আপনার যত রাগ, শশধরবাবুকে তো কিছু বলতে পারেন না আপনি? কই, বলুন তো দেখি ওকে কী বলবেন—

শশধর সরকার শুনতে পেয়েছে কথাগুলো। কিন্তু অগ্রাহ্য করে চলে যাচ্ছিল নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে।

কিন্তু গৌর মাস্টার ছাড়বার পাত্র নন। সোজা কাছে গিয়ে বললেন—শশধর, এই এখন তোমার সাড়ে দশটা বাজলো? তোমরা হলে স্কুলের পুরোনো টিচার—

শশধরও ছাড়বার পাত্র নয়। বললে—তুমি থামো, এসেছি এই-ই যথেষ্ট।

—তার মানে?

—মানে, তোমাকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি পণ্ডিত?

—তুমি বলছো কী শশধর? ইস্কুল কি আমার একলার? তোমার নয়? আমি কি আমার একলার জন্যে এই ইস্কুল গড়েছি? তুমি বলছো কী?

শশধর সরকার বললে—যখন ইস্কুল করেছ তখন করেছ, এখন তুমি কে? কৈফিয়ত দিতে হয় হেডমাস্টার মশাইকে কৈফিয়ত দেবো, সেক্রেটারিকে দেবো, কমিটীকে কৈফিয়ত দেবো। তুমি কেন মাঝখান থেকে ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করছো বলো দিকিনি? তুমি তোমার সংস্কৃত নিয়ে থাকো—

মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো গৌর মাস্টারের। মুখ দিয়ে কোনও

কথা বেরোল না। হঠাৎ যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল এক মুহূর্তে। কখন ঘণ্টা বেজেছে, কখন ক্লাস বসেছে, কখন স্তোত্রপাঠ হয়েছে, কিছুই কানে গেল না।

কিন্তু সেও খানিকক্ষণের জন্যে। তারপরেই হঠাৎ মনে পড়লো, দূর, শশধরের কথায় তিনি কেন মিছিমিছি মন খারাপ করছেন। শশধর তো সেদিনের লোক। শশধর কী জানবে কত কষ্ট করে মথুর সা' মশাই-এর কাছ থেকে এই সাত বিঘে জমি আদায় করেছিলেন। কত কষ্ট করে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান গোবিন্দ চক্রবর্তী মশাই-এর মতি ফিরিয়ে ছিলেন। সেই চক্রবর্তী মশাই-এর চিঠি নিয়ে এই বলরামপুরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করে করে চাঁদা তুলেছিলেন। সেই চাঁদা তুলে টিনের চালাঘর তৈরি করে একটা পাঠশালা করেছিলেন। সে-সব কথা শশধর সরকারই বা জানবে কী করে, আর ওই আজকালকার টিচার অনিলেশ চট্টোপাধ্যায়ই বা জানবে কী করে? কার কথায় তিনি মন খারাপ করছেন! দূর হোক গে ছাই!

নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে মহাভারতখানা তুলে নিলেন। মনটা খারাপ হলে ওইটে বার বার পড়ে নেন খানিকটা, পড়লেই মনটা সাদা হয়ে যায়। আর কারোর ওপর রাগ থাকে না।

বনপর্বে যুধিষ্ঠির বলছেন :

নাহং কর্মফলান্বেষী রাজপুত্রী চরাম্যুত।

দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত…

রাজপুত্রী, আমি কর্মফলান্বেষী হয়ে কোনও কর্ম করি না; দান করতে হয় তাই দান করি, যজ্ঞ করতে হয় তাই করি; ধর্মাচরণের বিনিময়ে যে ফল চায় সে ধর্মবণিক, ধর্ম তার কাছে পণ্যদ্রব্য। সে হীন, সে জঘন্য—

তা তখন বলরামপুরে এত বড় পিচের রাস্তাও ছিল না, এত বড় বড় বাড়িও ছিল না। যেখানে এখন বাসগুলো এসে দাঁড়ায়, ওখানে আগে ছিল গঞ্জ। এখনও গঞ্জ আছে, কিন্তু এ-গঞ্জ সে-গঞ্জ নয়। তখন মজুরের মাথায় মথুর সা'র আড়তের ধান বস্তা-বস্তা ইছামতীর ওপর নৌকোয় গিয়ে উঠতো।

বিধু কয়াল আড়তের মুখে ধান ওজন করে বস্তায় ভরতি করাতো। আর রাস্তার ওপর চটের থলি পেতে বসে শিবু মাহাতো মোট গুনতো। মজুররা মাথায় করে সেই বস্তা নিয়ে নৌকোয় তুলতো। শিবু মাহাতোর বাঁ পাশে পাহাড় হয়ে থাকতো কড়ি। সেখান থেকে একটা কড়ি নিয়ে রাখতো বাঁ পাশে। রামে রাম, দু'এ দুই, তিনে তিন,···তিন্ তিন্ তিন্, চারে চার, চার চার চার···

এমনি মুখে মুখে শতকিয়া বলতো, আর একটা কড়ি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে রাখতো। হিসেব বড় নচ্ছার জিনিস। একবার একটু অন্যমনস্ক হয়েছ কি সব কিছু গরমিল।

গঞ্জ পেছনে রেখে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে যাও। পায়ে-চলা পথ, খানাখন্দ পেরিয়ে পোয়াটাক গেলেই দক্ষিণপাড়া। বলরামপুরের দক্ষিণপাড়াটাই সবচেয়ে খারাপ। নোংরা চারদিকে। পাড়াটার মাঝখানে একটা পানা-পুকুর।

শিবানী প্রথমে বুঝতে পারেনি। স্বামীর সঙ্গে শহরে যাচ্ছে না শহরে যাচ্ছে! মোটামুটি শহর সম্বন্ধে মনে মনে একটা কল্পনা ছিল বইকি শিবানীর।

মোবারকপুরের শ্বশুরের ভিটে থেকে যখন গরুর গাড়িতে উঠেছিল

তখন অলক্ষ্য ইষ্ট দেবতাকে উদ্দেশ করে হাত জোড় করে প্রণামও করেছিল।

খুড়োমশাই গরুর গাড়ির সামনে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন—তাহলে গাঁ ছেড়ে চললে গৌর ?

গৌর ভট্টাচার্য খুড়োমশাই-এর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিল—হ্যাঁ খুড়োমশাই, আর কতদিন এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবো, এখানে একটা পাঠশালা নেই, টোল নেই, কাকে সংস্কৃত পড়াবো আমি ?

—তা যাবে কোথায় ঠিক করেছ ?

গৌর ভট্টাচার্য বলেছিল—বলরামপুরে—

—বলরামপুর ? সে কোথায় ? কোন জেলা ? শহর জায়গা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পাকা শহর।

—বামুন-কায়েত ক'ঘর ?

—তিরিশ ঘর বামুন আর দেড়শো ঘর মতন কায়েত বস্তি। তা ছাড়া বলরামপুরে হলো গিয়ে শিক্ষিত লোকের বাস। ওখানে লোকে গুণের কদর বোঝে। মোবারকপুরে মানুষ কোথায় যে সংস্কৃতর মর্ম বুঝবে ?

তা বটে। খুড়োমশাইও আর কিছু বলেননি তখন। আর কী-ই বা বলবেন। কথাটা তো মিথ্যে বলেনি তাঁর ভাইপো। মোবারকপুরের সে অবস্থা তখন আর নেই। জমিজমা পড়ে আছে কি বসতি করবার লোক নেই। ভদ্রলোক বলতে যাদের বোঝায় তারা একে একে সবাই চাকরি-বাকরির সূত্রে শহরে চলে গেছে। শুধু আম-কাঁঠাল-জমিজমা থাকলে তো আর পেট ভরবে না। তাহলে এত কষ্ট করে গুরু দক্ষিণে দিয়ে কাব্যতীর্থ হয়ে লাভটা কী হলো !

—তাহলে আর ফিরছো না এদেশে ?

—ফেরবার অবকাশ পেলে ফিরবো বৈ কি। কিন্তু তারা ক ছাড়বে ? বলরামপুরে তো কাব্যতীর্থের অভাব। একটা ভালো

টোল কি পাঠশালা কিছু নেই সেখানে। আমাকে পেলে তারা লুফে নেবে খুড়োমশাই—

—থাক গে, আমি আর ক'দিন। যদিও কখনও ফেরো তো আমার সঙ্গে আর বোধহয় দেখা হবে না। যেখানেই থাকো, আশীর্বাদ করি তোমরা ভালো থাকো—

সেই শেষ!

মোবারকপুরের সঙ্গে গৌর ভট্টাচার্যের সম্পর্ক সেই সেখানেই শেষ। কিন্তু তখন কি গৌর ভট্টাচার্য জানতেন এই বলরামপুরে এসে এমন বিপদে পড়বেন! আসলে তারই টোলের এক সহপাঠী কার্তিক। কার্তিক চক্রবর্তীর দেশ ছিল এই বলরামপুর। এই বলরামপুর থেকেই কার্তিক চক্রবর্তী নবদ্বীপের টোলে কাব্যতীর্থ পড়তে গিয়েছিল।

কার্তিক জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার দেশ কোথায় ভাই?

গৌর ভট্টাচার্য বলেছিলেন—মোবারকপুর—

—সে কোথায়?

গৌর ভট্টাচার্য বলেছিলেন—কীর্তি কাব্যালঙ্কারের জন্মভূমি। নদীয়া জেলা, থানা হাঁসখালি—আমরা তাঁরই গুরু বংশ—

কার্তিক বলেছিল—তাহলে তো তোমাদের প্রণাম করতে হয় ভাই। অত বড় ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর ক'টা ছিল?

গৌর ভট্টাচার্যি দুঃখ করে বলেছিলেন—হলে কি হবে ভাই, সে দেশ-গাঁ আর নেই। ন্যায়লঙ্কার মশাই-এর বংশ নির্বংশ হয়ে গেছে। তাঁর গুরু-বংশেরও আর কেউ বেঁচে নেই। আমি আছি, আর আছেন আমার একজন খুড়োমশাই—খুড়োমশাই-এর ছেলেরা কেউ আর মানুষ হয়নি, গাঁয়ের বারোয়ারিতলায় বসে বিড়ি খায় আর সখ হলে বিলে গিয়ে মাছ ধরে। তাতেই তাদের পরমার্থ লাভ হয়—

—তাহলে তুমি আমাদের দেশে চলে এসো না!

—তোমাদের দেশে? কোথায়?

—বলরামপুরে। চব্বিশ পরগণায়—

তা কথাটা বলেছিল কার্তিক চক্রবর্তী কতকাল আগে। হয়তো খানিকটা ভদ্রতা করেই। কিন্তু নবদ্বীপ থেকে মোবারকপুরে ফিরে গিয়েও মন থেকে মুছে যায়নি কথাটা। খুড়োমশাইকেও অনেকবার কথায়-কথায় বলেছিলেন গৌর ভট্টাচার্যি। গ্রামের পাঁচজন অল্পবিস্তর বর্ধিষ্ণু গৃহস্থদের কাছে কথাটা পেড়েছিলেন। কিন্তু কেউই তেমন গা করেনি। সংস্কৃত? কাব্যতীর্থ? ও শিখে কী হবে শুনি? ওতে কি পেট ভরবে [illegible]?

দূর হোক ছাই! কীর্তি কাব্যালঙ্কারের জন্মভূমির লোক যদি ওই কথা বলে তো সে দেশের ওপর কারো টান থাকে?

একদিন কথাটা সবাই শুনলে। শুনে অবাক। বললে—বলরামপুর? সে আবার কোথায় গো?

—আমার গুরুভাই কার্তিক চক্কোত্তির দেশ। সোনার দেশ তাদের। আমরা এক সঙ্গে কাব্যতীর্থ পড়েছি নবদ্বীপে, সেখানকার মানুষ গুণের কদর করে, তা জানো—তোমাদের মত নয় তারা—

সেই সামান্য সম্পর্কের সূত্রটা অবলম্বন করেই গৌর ভট্টাচার্যি একদিন বৌকে নিয়ে মোবারকপুর থেকে গরুর গাড়িতে চেপে বসেছিলেন। দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা। রেলের ইস্টিশান মাইল আষ্টেকের কাঁচা পথ। সেইখানে ট্রেনে চেপে সোজা এই বলরামপুর।

কিন্তু কোথায় কার্তিক? কার্তিক চক্রবর্তী? নবদ্বীপের কাব্যতীর্থ উপাধি পাওয়া ব্রাহ্মণ সন্তান?

বউ নিয়ে সবে ট্রেন থেকে নেমেছেন বলরামপুরে।

রাস্তার একজন লোক বললে—কার্তিক চক্কোত্তি? আরে তিনি তো আর এখানে থাকেন না! তিনি তো দেশ ছেড়ে কাশীবাসী হয়েছেন?

—তাহলে কী হবে?

সে এক লজ্জাকর পরিস্থিতি! গৌর ভট্টাচার্যি নিজের দুর্বুদ্ধিতার জন্যে কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

ইস! আগে একটা পত্র দিয়ে আসা উচিত ছিল। এমন অচেনা জায়গায় পরিবার নিয়ে হুট করে তাঁর আসা উচিত হয়নি।

আর তার ওপর গৃহিণী তখন সঙ্গে রয়েছে।

তা রঙ্গরামপুরের লোকেরা ভালই বলতে হবে। একটা চলনসই আশ্রয় তারা যোগাড় করে দিলে। দক্ষিণ পাড়ার মাঝামাঝি জায়গায় একটা দু'কামরা ঘরওয়ালা বাড়ি। তার সামনে লাগোয়া উঠোন। উঠোনের কোণের দিকে একটা চালাঘর। সেখানে রান্নাবান্না হবে। আর তারই সামনে পুকুর।

শিবানী ঘোমটার ফাঁকে বাড়িটা একবার দেখে নিলে।

বললে—এখানে থাকবো কী করে গো?

গৌর ভট্টাচার্য রেগে গেলেন। বললেন—কেন, এ তোমার মোবারকপুরের চেয়ে ঢের ভালো।

শিবানী বললে—জল? খাবার জলের কী ব্যবস্থা?

—কেন, ওই যে সামনে পুকুর দেখলে। অঢেল জল। ওই পুকুর থেকে কলসী করে জল তুলবে আর খাবে। একটু পাঁক আছে, তা তাতে কী হয়েছে। মোবারকপুরে এমন বাড়ির দোর-গোড়ায় পুকুর ছিল? এখানে কত জল খাবে খাও না—কেউ বারণ করছে না—

তা এসব কতকাল আগেকার কথা। সেই মথুর সা' মশাই সেদিন জমি দিলেন। টাকা দিলেন ডিসট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান গোবিন্দ চক্রবর্তী মশাই। সেসব দিনের কথা কেবল গৌর ভট্টাচার্যি জানেন। আর জানে ওই জনার্দন।

জনার্দন গোড়া থেকেই পাঠশালার পেছনে।

শিবানীর তখন বয়েস কম। অত-শত কথা বুঝতো না। গৌর ভট্টাচার্যি একদিন ছুট করে এসে বললেন—তোমার গলার হারটা

একবার দাও তো গা—

—আমার গলার হার? হার কী হবে?

গৌর ভট্টচার্যি বললেন—টাকা কম পড়েছে, ওটা বেচতে হবে—

—কীসের টাকা কম পড়েছে?

—পাঠশালার বাড়ির। দেয়াল গাঁথা হয়ে গেছে, টিনের চাল দিতে হবে, এদিকে এখন হাতে টিন কেনবার পয়সা নেই।

শিবানী আর কথা বাড়ালে না। বাক্স খুলে দশ ভরির সোনার হারটা পণ্ডিত মশাই-এর হাতে তুলে দিলে।

শুধু হারই নয়। এমনি করে শিবানী বিয়ের সময় যা দু'একটা গয়না পেয়েছিল সবই পাঠশালার গর্ভে গেল। এক জোড়া বালা ছিল, আর ছিল মাকড়ি। সেগুলো আগেই গিয়েছিল। এর পর শিবানীর গায়ে আর কিছুই রইল না। শুধু দু'গাছা শাঁখা, সেই শাঁখা জোড়া পরেই জীবন কেটে গেল।

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—তোমার গয়না কি আমি বরাবরের মত নিয়ে নিচ্ছি নাকি। আবার গড়িয়ে দিলেই তো হলো।

শিবানী বলতো—আর তুমি গড়িয়ে দিয়েছ—

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—গড়িয়ে দেবো না মানে? এই দেখ না, পাঠশালায় এবার তিরিশ জন ছেলে হয়েছে—এর পর আর দুটো বছর সবুর করো, তখন দেড়শো ছেলে না করে আর ছাড়ছিনে—তখন পাঠশালাটাকে ইস্কুল করে ছাড়বো—

সেই দেড়শো ছেলের জন্যে সেদিন গৌর ভট্টাচার্যি গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোশামোদ করেছেন। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান গোবিন্দ চক্রবর্তী মশাই তখন বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। মথুর সা'ও তখন আরো বুড়ো। তাঁরা আর তেমন খাটতে পারেন না স্কুলের জন্যে। কিন্তু গোবিন্দ চক্রবর্তী মশাই নিজের ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। মথুর সা'র ছেলে নিমাই সা'ও ভর্তি হয়েছিল গৌর ভট্টাচার্যির স্কুলে।

শিবানীর সে-সব দিনের কথা মনে আছে এখনও। সেই সকাল

বেলা গৌর ভট্টাচার্যি মশাই চাদরখানা পাট করে কাঁধে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। তারপর সংসারের মানুষটা যে কী খাবে, কী রাঁধবে, চাল-ডালের যোগাড় আছে কিনা সেদিকে তাঁর খেয়াল থাকতো না। শিবানী চুপচাপ দাওয়ায় বসে বসে হা-পিত্যেস করে রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে অপেক্ষা করতো।

শম্ভুর মা কাজ করতে এসে অবাক।

বলতো—হ্যাঁ গো, কই, আজ ভাত চড়াবে না নাকি খুড়ীমা?

তারপর যখন জানতে পারতো তখন আকাশ থেকে পড়তো।

—ওমা, কী আক্কেল গা ঠাকুর মশাই-এর। পাঠশালা করলে কি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করতে হয়?

তারপর কোথা থেকে দু'মুঠো চালে-ডালে চড়িয়ে শম্ভুর মা রান্নার যোগাড় করে দিত তবে খাবারের যোগাড় হতো। সন্ধ্যেবেলা যখন বাড়ি ফিরতো মানুষটা তখন কোনও দিকেই তার খেয়াল থাকতো না আর। মুখ-হাত-পা ধুয়ে খেতে বসতে বসতে বলতেন—জানো গো, আরো দশটা ছেলেকে ভর্তি করে নিয়েছি। ভর্তি কি সহজে হয়? অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে বাপ-খুড়োদের রাজী করালাম। এবার দেখো, আমাদের ইস্কুল ঠিক বৃত্তি পাবে—

শিবানী আর থাকতে পারতো না।

বলতো—তা তোমার ইস্কুলের ছেলেরা বৃত্তি পেলে কি আমার পেট ভরবে?

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—তুমি বুঝছো না গো, ছেলেগুলোকে মানুষ করতে পারলে কত উপকার হবে বলো তো ওদের? ওদের কথা ভাবো তো একবার। একেবারে সব গোমুখ্যু হয়ে বসে ছিল এ্যাদ্দিন, দেবনাগরি অক্ষর পর্যন্ত লিখতে পারে না ঠিক মত—

এ-সব সেই পুরোনো আমলের কথা। তুমি তখন জন্মাওইনি, আমিও তখন জন্মাইনি হে, এ সব কথা তুমি জানতে না পারো, তাতে ক্ষতি নেই। তুমি সোজা গিয়ে জনার্দনকে জিজ্ঞেস করবে—গৌর ভট্টাচার্যি মশাই আছেন?

এ সেই জনার্দন!

সেই গোড়া থেকে, একেবারে পাঠশালার পত্তন থেকে সে দারোয়ানি কাজ করে আসছে। আসলে জনার্দন দারোয়ান নয়। পিওন। মানে হেড পিওন। হেড পিওন বটে, কিন্তু কাজ করতে হয় ওই সদর গেটে। সদর গেটের ধারে তার জন্যে ঘর করে দিয়েছিলেন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই।

বলেছিলেন—তোমাকেই এখানে বসে পাহারা দিতে হবে জনার্দন। ছেলেরা দেরি করে এলে, তাদের ঢুকতে দেবে না। যেই ঘণ্টাটি বাজবে আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ করে দেবে—

বলরামপুরের গঞ্জে এখন যেখানে বাসগুলো এসে দাঁড়ায়, ওইখানে সেই মথুর সা' মশাই-এর দোকান এখনও আছে। কিন্তু মথুর সা' নিজে আর বেঁচে নেই। আছে নিমাই সা'। নিমাই সা' মশাইও তার বাপের জায়গায় এখন কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছে। আর গোবিন্দ চক্রবর্তীর ছেলে হরেন চক্রবর্তী হয়েছে সেক্রেটারি, দু'জনেই ওই গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর ছাত্র। তারা গৌর ভট্টাচার্যির হাতের কিল খেয়েছে এককালে।

আর আছে ভবরঞ্জন। ভবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

ছেলেটা ছোটবেলায় কী মুখচোরাই না ছিল!

গৌর ভট্টাচার্যি ওই ভবরঞ্জনকেই একদিন গেটের বাইরে আটক

করেছিলেন। সাড়ে দশটার পর এসে হাজির হয়েছিল ভব।

—কী রে, তোর এত দেরি হলো যে?

কাঁদো কাঁদো মুখে ভব বলেছিল—আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, আর কখনও দেরি হবে না—

গৌর ভট্টাচার্যি বলেছিলেন—সে হবে না, যখন তখন হবে না, আজকে দেরি হলো কেন তাই আগে বল—

—আজকে কাপড় শুকোয়নি।

—কাপড় শুকোয়নি মানে?

—মা জামা-কাপড় সেদ্ধ করে দিয়েছিল কাল, রাত্তিরে শুকোয়নি—

—শুকোয়নি তো এখন ক করে এলি? দেখি, ভিজে কাপড়?

গেটের বাইরে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই ভব'র কাপড়টা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলেন। একেবারে জবজব করছে ভিজে।

—যা যা, জামা-কাপড় বদলে আয়। ভিজে জামা-কাপড়ে থাকলে জ্বর হবে যে। ভিজে জামা-কাপড় বদলে আয়, যা—

ভব'র মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো।

বললে—আমার আর শুকনো জামা নেই যে পণ্ডিত মশাই—

—তবে যা, বাড়ি যা। আজকে তোর ছুটি। আজকে তোকে আর ইস্কুলে আসতে হবে না। আগে শরীর তারপরে পড়া, যা-যা—

ছুটি হয়ে গেল ভবরঞ্জনের। কাঁদো-কাঁদো মুখে ভবরঞ্জন বাড়ি চলে গেল। আজকের এই বলরামপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার ভবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম-এ পাশ করেছে, বি-টি পাশ করেছে—। কিন্তু পণ্ডিতমশাই-এর মুখের ওপর কথা বলবার সাহস হয়নি তার এখনও। এখনও পণ্ডিত মশাই-এর মুখের হুকুমও নড়াবার হিম্মৎ নেই তার।

মনে আছে, ভবরঞ্জন সেই ছোটবেলায় সেদিন ইস্কুল থেকে সোজা বাড়ি চলে গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা মা তখন তুলসী তলায় পিদিম

দিচ্ছে, হঠাৎ বাইরে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর গলার আওয়াজ—ভব, ভব আছিস—

ধড়মড় করে দাওয়া থেকে উঠে গিয়ে সদর দরজায় গিয়ে দেখে সশরীরে পণ্ডিত মশাই হাজির।

—মাস্টার মশাই আপনি ?

গৌর ভট্টাচার্যি মুখ ভেঙচে উঠলো—মাস্টার মশাই আপনি ! হারামজাদা কোথাকার ! তুমি ভিজে কাপড়ে ইস্কুলে যাবে আর আমি তোমাকে একবার দেখতে আসবো না ? তুমি ভেবেছ কী ?

ভব'র মা বিধবা মানুষ। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা দিয়ে সামনে এসে হাজির।

বললে—আসুন পণ্ডিত মশাই, আসুন—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই হাতে একগাদা খাতা-পত্র নিয়ে উঠোনের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। ততক্ষণে ভব'র মা একটা পিঁড়ি পেতে দিয়েছে মাটির দাওয়ার ওপর। বললে—বসুন পণ্ডিত মশাই—বসুন—

—না, আমি বসবো না, কিছুতেই বসবো না আমি বৌমা। তোমার বাড়িতে আমি আর বসবো না—বলে থপাস করে বসে পড়লেন পিঁড়ির ওপর।

তারপর হাঁটু দুটো জোড় করে তুলে বললেন—তোমার আক্কেল কী রকম শুনি বৌমা, তোমার পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটা ছেলে, তুমি কোন আক্কেলে ছেলেটাকে ভিজে জামা পরে ইস্কুলে পাঠালে শুনি ? যদি জ্বর-জাড়ি হতো ! তখন কী হতো বলো দিকিনি, তখন তো আমাকেই সামলাতে হতো সব। আমি একলা মানুষ, আর আমার এতগুলো ছেলে, আমি কতগুলো ছেলেকে দেখবো, কোন দিক সামলাবো ?

তা সেই ভব, ভবরঞ্জন, এখন স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছে। ওই গৌর ভট্টাচার্যের জন্যেই বি-এ পাশ করেছে, বি-টি পাশ করেছে। বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে। সেই বুড়ি বিধবা মা'ও একদিন

মারা গেছে। তারপর মাইনে থেকে টাকা জমিয়ে জমিয়ে উত্তরপাড়ার দিকে একখানা বাড়িও করেছে। গৃহপ্রবেশের দিন সকলকে নেমন্তন্ন করেও খাইয়েছিল ভবরঞ্জন।

পণ্ডিত মশাই গিয়েছিলেন সেদিন।

দূর থেকেই চিৎকার করে ডাকলেন—কই রে, ভব কই ?

হেড মাস্টার হলেও এককালের ছাত্র। পণ্ডিত মশাই-এর গলা শুনেই একেবারে দৌড়ে এসে পায়ের ধুলো নিয়েছে।

—থাক, থাক, থাক—

ভব বললে—না পণ্ডিত মশাই, আজকের দিনে পায়ের ধুলো দিতে আপনি আর আপত্তি করবেন না—

গৌর ভট্টাচার্যি বললে—আচ্ছা, তাহলে নে, পায়ের ধুলো নিলে যদি তোর ভালো হবে মনে করিস, তো নে—

নিমাই সা'ও হাজির ছিল সেখানে। মথুর সা'র ছেলে। গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি, পায়ে পাম্পশু। কমিটির প্রেসিডেন্ট সে। পাকা প্রেসিডেন্ট। ইস্কুল যতদিন থাকবে ততদিন মেম্বর থাকবে নিমাই সা'। বলরামপুরের গঞ্জে 'বলরামপুর ভ্যারাইটি স্টোর্সে'র একমাত্র মালিক। তারপর ছিল ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান গোবিন্দ চক্রবর্তীর ছেলে নরেন চক্রবর্তী, এ্যাডভোকেট। নরেন স্কুলের সেক্রেটারি। তারপর আছে শশধর, অনিলেশ, শিশির, বলাইচাঁদ, কালীধন! সবাই পণ্ডিত মশাই-এর এককালের ছাত্র সব। নিমাই সা' হাতে মুঠো করে আঙুলের ফাঁকে ফু-ফু করে সিগারেট টানছিল। পণ্ডিত মশাইকে দেখেই জুতোর তলায় সেটা মাড়িয়ে দিয়েছে।

সবাই একসঙ্গে পণ্ডিত মশাইকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো।

—আরে, তোমরা দেখছি সবাই এসে হাজির হয়েছ! বোস বোস—

পণ্ডিত মশাই বসতেই সবাই বসলো।

পণ্ডিত মশাই বললে—বাঃ বাঃ, খুব ভালো বাড়ি হয়েছে তোমার

ভব। খুব খুশী হলাম। কৃতি পুরুষ আমাদের ভব, কী বলো নরেন—

ভব সবিনয়ে বললে—কী যে বলেন পণ্ডিত মশাই, সবই আপনার দৌলতে। আপনি না থাকলে বলরামপুরে কি স্কুল হতো, না আমরা লেখাপড়া শিখতে পারতুম—

পণ্ডিত মশাই থামিয়ে দিলেন ভবকে। বললেন—তুমি থামো দিকি। কেউ কাউকে মানুষ করতে পারে? তুমি কর্মযোগ করেছ তাই ফল পেয়েছো—

সেক্রেটারি নরেন চক্রবর্তী বললে—না পণ্ডিত মশাই, আসলে আপনি। বাবার কাছে তো সব শুনিচি—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না হে, সবই হলো কর্মযোগ। নিষ্কাম হয়ে কর্ম করলেই লোকে ফল পাবে—কর্ম কি কখনও ব্যর্থ হয়?

তা এসব সেই আদিকালের কথা। তখন তুমিও জন্মাওনি, তোমার পাবলিশারও জন্মায়নি। সেই বলরামপুরের সেই ছোট পাঠশালাটা কখন আস্তে আস্তে হাই স্কুলে পরিণত হয়েছে তা কেউ জানে না। জানে না মানে কেউ খেয়ালই রাখেনি।

তুমি গিয়ে জনার্দনকে জিজ্ঞেস করবে—পণ্ডিত মশাই-এর ঘরটা কোন দিকে?

জনার্দন বলবে—ওই যে ওই সিঁড়ির নিচের প্রথম ঘরখানা—

কিন্তু তুমি গেলেই কি গৌর ভট্টাচার্যি মশাইকে পাবে? গৌর ভট্টাচার্যি তখন সোজা একেবারে হেডমাস্টারের ঘরে।

—ভব!

ভবরঞ্জন কাজ করতে করতে মাথা তুলেই পণ্ডিত মশাইকে দেখে সোজা হয়ে বসলো।

—এসব কী হচ্ছে বলো তো ভব, তুমি কিছু দেখছো না। সবাই দেরি করে ইস্কুলে আসছে, যার যা খুশী তাই করছে। আমার আমলে তো সেকালে এমন হতো না! আমার আমলে তো সবাই ঠিক সময়ে ইস্কুলে আসতো। আজকে অনিলেশকে ধরেছি আর শশধরকে ধরেছি—

ভবরঞ্জন বললে—অনিলেশ আমাকে বলেই রেখেছিল ওর স্ত্রীর বড় অসুখ—

—বলেছিল? তোমাকে তাহলে আগে বলেছিল সে?

ভবরঞ্জন বললে—হ্যাঁ, আমাকে জানিয়ে রেখেছিল, দু'চারদিন ওর একটু দেরি হতে পারে—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তা ভালো। বলে রাখলে ভালো। কিন্তু শশধরের কী কাণ্ড বলো দিকিনি। আমি বলতে গেলাম তা আমাকে একেবারে মানতেই চাইলে না। বললে—রাখো, রাখো—

—তাই নাকি! আপনাকে এই কথা বললে?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তোমরা কিছু দেখ না বলেই আমাকে এই কথা বলতে সাহস করে। তোমার জন্যেই তো ওদের দুঃসাহস এত বেড়ে গেছে!

ভব বললে—আপনি যান পণ্ডিত মশাই, আমি শশধরবাবুকে ডেকে বোঝাচ্ছি—

গৌর ভট্টাচার্যি তবু ছাড়লেন না। বললেন—অথচ তুমি এককালে এখানকার ছাত্র ছিলে। তোমরাও তো এককালে এ-ইস্কুলে পড়েছ, তখন অরাজকতা দেখেছ? কখনও কেউ দেরি করে এলে আমি তাদের ঢুকতে দিয়েছি? চক্রবর্তী মশাই যখন সেক্রেটারি ছিলেন তখন এমন কাণ্ড কেউ করতে সাহস করতো?

বলতে আরম্ভ করলে আজকাল গৌর ভট্টাচার্যি মশাই সেকালের সব পুরোনো কাহিনী গড়গড় করে শুনিয়ে দেন সবাইকে। সেই

কবে মথুর সা' মশাই জমি-বাগান দিয়েছিলেন, কবে একদিন টাকার অভাবের সময় ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে বিপদ-উদ্ধার করেছিলেন, তার কাহিনী শুনিয়ে দেন।

ভব বললে—আপনি উত্তেজিত হবেন না পণ্ডিত মশাই, আমি শশধরবাবুকে এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি—

বলেই ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলো—দিনু—

দিননাথ হেডমাস্টারের পিওন। দিনু আসতেই হেডমাস্টার বললে—আরে দেখ তো দিনু, শশধরবাবু কমনরুমে আছেন কি না, থাকলে আমার কাছে একবার ডেকে নিয়ে আসবি—

দিনু চলে গেল।

গৌর ভট্টাচার্যি চলে যেতে যেতে বললেন—এইরকম সকলকে এক-একবার শাসন করবে, নইলে সবাই যে সাপের পাঁচ পা দেখবে ভব। তুমি নিজে যদি ঢিলে দাও তো ওরাও যে ঢিলে দেবে—

বলে আর দাঁড়ালেন না। সোজা দোতলার বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় উঠোনে এলেন। চারদিকে চেয়ে দেখলেন। চারদিকে সব ঠিক আছে কি না। কোণের দিকে ছেলেদের জল খাবার জায়গা। টাটকা জল ধরে রাখা হয় মাটির জালাতে। জালা অপরিষ্কার থাকলে ছেলেদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। পণ্ডিত মশাই ভেতরে উঁকি মেরে দেখলেন—না, জলে কোনও ময়লা নেই—

তারপর নিজের ঘরের সামনে আসতেই দেখলেন কে একজন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো যেন তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছে।

বললেন—কে? কে আপনি? কী চান?

তুমি সসম্ভ্রমে তখন একটা নমস্কার করবে।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই তোমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলবেন —আসুন, ভেতরে আসুন—

তুমি পণ্ডিত মশাই-এর পেছনে পেছনে গিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকবে।

—তারপর ?

দিদিমা বললে—তারপর মা, সেই মোবারকপুর থেকে একদিন গরুর গাড়িতে চড়ে তোমার দাতুর সঙ্গে আমি এখানে চলে এলাম। এই বলরামপুরে—

রানী জিজ্ঞেস করে—তোমাদের মোবারকপুরে মেলা হতো দিদিমা ?

—সে যে অজ পাড়াগাঁ মা, সেখানে মেলা হবে কেন ?

তারপরই দিদিমা বলে—আর সেখানে ক'দিনই বা থেকেছি মা, আমার যখন বিয়ে হলো তখন আমার বয়েস আট বছর—

—ওমা, বলো কী দিদিমা, আট বছর ?

রানী হেসেই অস্থির। সেই আট বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছে শিবানীর। নতুন শ্বশুর বাড়ি, নতুন খুড়শ্বশুর, খুড়শাশুড়ি। অত বোঝবার বয়েসও নয় তখন তার। তার কয়েক বছর পরেই এখানে চলে এসেছে পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে। তখন এই বলরামপুরই কি এই রকম ছিল নাকি ? সন্ধ্যেবেলা পুকুর-ঘাটে যেতে কত ভয় করতো জানিস ? এখন তো তুই হুটহুট করে যখন-তখন চলে আসিস, রাত-বিরেত নেই যখন ইচ্ছে হলো আমার কাছে এসে গল্প করিস। তখন হলে তুই পারতিস ?

সেকালে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান গোবিন্দ চক্রবর্তী মশাই শেষ বয়েসে একেবারে বাড়ির ভেতরে চলে আসতেন। কর্তার সঙ্গে ইস্কুল নিয়ে পরামর্শ করতেন। কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে যেত। ওই দাওয়া, এখন যেখানে বসে পণ্ডিতমশাই ছেলেদের পড়ান, ওইখানে বসে কথা হতো দু'জনে।

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—আরো দুশো টাকা আমাকে যোগাড় করে দিন চক্কোত্তি মশাই—আমি আর চালাতে পারছিনে—

চক্কোত্তি মশাই বলতেন—কেন? দুশো টাকা আবার হঠাৎ কী কাজে লাগবে?

—আজ্ঞে, আরও পঞ্চাশখানা বেঞ্চি তৈরি করতে হবে—

—তা, আমার তো কাঁঠাল গাছ রয়েছে, কয়েকটা গাছ বুড়ো হয়ে গেছে আর ফলও ধরে না তাতে; তাই দিয়েই না হয় চালিয়ে নাও। আর ছুতোর মিস্ত্রির জন্যে যে-ক'টা টাকা লাগে, তাই না-হয় দেওয়া যাবেখন।

শিবানী তখন ছোট। ক্ষিধে পেয়ে যেত তার। সারাদিন কাজ-কর্ম করে গায়ে-গতরে ব্যথা হয়ে যেত। সন্ধ্যে না-হতেই তখন চোখ জুড়ে ঘুম আসতো। কর্তাদের কথা আর শেষই যেন হয় না তখন।

—ওমা, তুই এখানে? আমি এদিকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!

শিবানী হাসতো। বলতো—বৌমা, তুমি আর ওকে বোকো না। বেচারি আমার কাছে বসে-বসে গল্প শুনছিল।

—গল্প?

সেক্রেটারি নরেন চক্রবর্তীর বউ বাসন্তী শহরের মেয়ে। মেয়ের খোঁজে একেবারে পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। বললে—বকবো কেন খুড়িমা, তা, ও যে এখানে আছে তা তো আমাকে বলে আসতে হয়।

শিবানী আদর করে রানীর কাঁধে হাত দিয়ে বলতো—রানী এ-বাড়িরই মেয়ে বৌমা, জন্মেছে শুধু তোমার কোলে—এই যা তফাত—

বৌমা বলতো—তাহলে থাক এখানেই, তোমার এখানেই ঘুমোক, আমরা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়িগে যাই—ওকে রাক্ষুসী এসে ধরে নিয়ে যাবেখন—

—ওগো, বৌমা শোন, রাগ কোর না, রানীকে নিয়ে যাও।

যাও তো মা, এবার তোমাদের বাড়ি যাও, কাল আবার এসো—

হঠাৎ বাইরে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর গলা শোনা গেল—কই গো, শম্ভুর মা, দরজা খুলে দাও—

—ওই দাদু এসেছে—

বলতে বলতে রানী গিয়ে দৌড়ে সদরের হুড়কো খুলে দিলে।

পণ্ডিতমশাই ভেতরে সবাইকে দেখে অবাক।

রানী বললে—দাদু, তুমি এত দেরি করে ফিরলে যে? তুমি যে আমাকে বলেছিলে বিকেল বেলা বেলাবেলি ফিরবে?

পণ্ডিত মশাই বললেন—তুমি মা ছেলেমানুষ, তুমি কী করে জানবে আমার কত কাজ?

রানী বললে—তোমার ছাই কাজ, কেবল চেয়ারে বসে বসে ছেলেদের পড়াবে আর তাদের ফেল করিয়ে দেবে।

পণ্ডিত মশাই বৌমার দিকে চেয়ে বললেন—শুনলে তো বৌমা তোমার মেয়ে কী বলছে? তোমার মেয়ে শুধু আমাকে ফেল করিয়ে দিতেই দেখে—

তারপর রানীর দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ রে, বিনু যে স্কলারশিপ পেয়ে সদরে পড়তে গেছে তা তো দেখলি নে! সে মাসে তিরিশ টাকা করে বৃত্তি পায় তা জানিস!

বৌমা বললে—আপনি আদর দিয়ে দিয়েই ওকে অত বাড়িয়েছেন খুড়োমশাই। আর কারো কথা শুনতে চায় না, আপনি ওকে একটু বকে দিন তো খুব—

পণ্ডিত মশাই রানীর চিবুকটা ধরে বললেন—হ্যাঁ রে রানী, তোকে বকবো? তোর মা যা বলছে তাই করবো?

রানী বললে—তুমি বকলে আমিও বুঝি বকতে জানি না? আমিও তোমাকে বকে দেবো—

—ওমা, ও কী কথা! মেয়ের কথা শোন! গুরুজনের সঙ্গে ওমনি করে কথা বলতে হয়?

তারপর রানীর হাত ধরে টানতে লাগলো বাসন্তী।

বললে—আয়, আজকে আমি তোকে বাড়িতে গিয়ে মার খাওয়াবো ঠিক, চল্ আগে বাড়ি চল্—বাড়ি চল্ শিগগির—

রানী দাদুকে জাপটে ধরে রইল জোর করে।

—কী হলো, আয়, আয় বলছি—

দাদুর হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে রানী তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। আর পণ্ডিত মশাই রানীর কাণ্ড দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

শিবানী বললে—থাক থাক বৌমা, তুমি বাড়ি যাও, উনি রানীকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবেনখন, তুমি ভেবো না কিছু—

পণ্ডিত মশাই বললেন—খুব চালাক হয়েছে তোমার মেয়ে বৌমা, দেখেছো, মুখটা কেমন লুকিয়ে রেখেছে। মনে করছে কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না—

শিবানী আবার বললে—না বৌমা, তুমি কিছু ভেবো না, যদি কর্তা কিছু বলেন তো বলে দিও তোমার খুড়োমশাই আসতে দেননি—

বাসন্তী আর কী বলবে! আবার যেমন এসেছিল তেমনিই সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সেকালের বলরামপুরের বর্ধিষ্ণু লোক বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন গোবিন্দ চক্রবর্তী মশাই। বলরামপুর যখন অজ পল্লীগ্রাম ছিল তখন তাঁর পূর্বপুরুষ ওইখানে বসতি আরম্ভ করেছিলেন। তারপর ওকালতি করে প্রচুর টাকা রোজগার করে বলরামপুরের গণ্যমান্য লোক বলে দশজনের কাছে পরিগণিত হয়েছিলেন। শেষ জীবনে যখন প্রথম ডিসট্রিক্ট বোর্ড হলো, তিনি হয়েছিলেন তার

চেয়ারম্যান। শুধু টাকায় নয়—সম্মান, প্রতিপত্তিতেও তিনি ছিলেন সমাজের অগ্রগণ্য।

তাঁরই এক ছেলে নরেন। নরেন চক্রবর্তীও যথাসময়ে ওকালতি পাশ করে কোর্টে যাতায়াত আরম্ভ করে দিলে। সেও ওই হাতে-খড়ি থেকে শুরু করে ওই গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর কাছেই মানুষ। বলরামপুর স্কুল থেকেই নরেন পাশ করে বেরিয়ে সদরের কলেজে পড়তে গেল একদিন।

কাছাকাছি বাড়ি। গৌর ভট্টাচার্যি মশাইকে দেখলেই নরেন হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলতো।

গৌর ভট্টাচার্যি জিজ্ঞেস করতেন—কেমন আছ নরেন?

নরেন বলতো—ভালো পণ্ডিত মশাই—

বলে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতো।

—বৌমা কেমন আছেন? সুশীল পড়ছে-টড়ছে কেমন বাড়িতে?

নরেন বলতো—মাস্টার মশাইরা আছেন, তাঁরাই দেখছেন—

—কাকে রেখেছ?

—কাকে আর রাখবো। শশধরবাবুকে রেখেছি অঙ্কটা দেখবার জন্যে, বঙ্কিমবাবুকে রেখেছি ইংরিজিটা দেখতে; ভূগোল, ইতিহাস পড়ান কান্তিবাবু আর···

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—সংস্কৃতটা কে পড়ায় তাই বলো?

—আজ্ঞে, আপনাকে আর কী করে বলি, আপনাকে বলবার তো সাহস হয় না—

—কেন? আমি বুড়ো হয়ে গেছি বলে?

গৌর ভট্টাচার্যি যখন রেগে যেতেন, তখন সকলের ভয় করতো। বলতেন—কেন, আমি তোমাদের পড়াইনি? সারাজীবন ধরে বল-রামপুরের ছেলেদের কে সংস্কৃত পড়িয়েছে শুনি? দেখ বাপু, কেউ ভুল সংস্কৃত পড়বে এটা আমার বরদাস্ত হবে না। আমি যখন নবদ্বীপের টোলে পড়তাম তখন গুরুমশাই-এর কাছে কত বেত খেয়েছি তা জানো।

তারপর শুরু হতো সেইসব আমলের গল্প। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প শুনতে শুনতে অনেকেরই কাজ-কর্ম মাথায় উঠতো।

হঠাৎ পণ্ডিত মশাই বলতেন—তোমার কোর্টের দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো বাবা?

নরেন সবিনয়ে বলতো—হ্যাঁ মাস্টার মশাই, আজকে কোর্টে আমার একটু সকাল-সকাল কাজ ছিল—

তখন যেন হুঁশ হতো পণ্ডিত মশাই-এর। বলতেন—তা সে-কথা আমাকে আগে বলবে তো, দেখ দিকিনি কাণ্ড, আমি তোমার কত সময় নষ্ট করে দিলুম—

তা সেদিন কোর্ট থেকে ফিরতে ফিরতেই দেরি হয়ে গেল নরেনের। বাসন্তী বললে—আজ তোমার এত দেরি হলো যে?

নরেনের মুখটা যেন কেমন খুব গম্ভীর-গম্ভীর।

বাসন্তী বললে—কী হলো? আজকে মামলায় হেরে গেছ বুঝি?

নরেন সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—রানী কোথায়?

বাসন্তী বললে—ইস্কুল থেকে এসে খুড়ীমার বাড়িতে গেছে—

—এই সময়ে গেল? আর সময় পেলে না?

বাসন্তী অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন, এ-সময়ে কি যায় না সে? এ সময়ে তো রোজই যায়।

এর কোনও উত্তর দিতে পারলে না নরেন।

বাসন্তীর বড় কৌতূহল হলো। বললে—কী হলো তোমার বলো দিকি? তোমাদের ইস্কুলের কমিটিতে আবার ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

নরেন তখন কোর্টের ধড়া-চূড়া ছাড়তে ছাড়তে বললে—কী যে বলো তুমি, আমি ইস্কুলের সেক্রেটারি, আমি আবার কার সঙ্গে ঝগড়া করবো ?

বাসন্তী বললে—বা রে, তোমাদের ঝগড়া হয় না কমিটিতে ?

নরেন শেষ পর্যন্ত আর খবরটা চেপে রাখতে পারলে না।

বললে—শোন, মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে খবরটা পেয়ে পর্যন্ত—

—কী খবর ?

বাসন্তী খবরটা শোনবার আশঙ্কায় আরো কাছে সরে এল।

নরেন বললে—পণ্ডিত মশাই-এর মেয়ে মারা গেছে—

—সে কী ? বলছো কী তুমি ? আমাদের অবন্তী ?

নরেন বললে—হ্যাঁ—

বাসন্তী জিজ্ঞেস করলে—কী করে মারা গেল ? কী হয়েছিল ? কে খবর দিলে ? আহা গো, খুড়ীমার একটি মাত্র মেয়ে, একটা নাতিও আছে খুড়ীমার…

নরেন তখন জামা-কাপড় বদলেছে। বললে—আমি একবার পণ্ডিত মশাই-এর ওখানে যাই, দেখে আসি গিয়ে—তুমিও যাবে নাকি ?

বাসন্তীর মনে তখনও যেন শোকের ঘোর কাটেনি।

বললে—হ্যাঁ গো, তুমি কোত্থেকে খবরটা পেলে ?

নরেন বললে—আমি কোর্ট থেকে ইস্কুলে গিয়েছিলুম, সেখানেই যে টেলিগ্রাম এল।

—তারপর ?

—তারপর হেডমাস্টার ভবরঞ্জন খবরটা দিতে ভয় পাচ্ছিল। তা আমি বললুম এ-খবর তো আর চেপে রাখা উচিত হবে না। বলে আমিই গেলুম পণ্ডিত মশাই-এর ক্লাশে। বাইরে এসে টেলিগ্রামটা দিলুম। তিনি পড়লেন।

—তারপর ?

—তারপর বললেন—দাঁড়াও, আমি বাকি ক্লাশটা করে আসি—বলে আবার ক্লাশে গিয়ে পড়াতে লাগলেন।

তারপর যখন ঘণ্টা বাজলো ভবরঞ্জন পণ্ডিত মশাই-এর কাছে গিয়ে বললে—পণ্ডিত মশাই, আপনি এখন বাড়ি চলে যান, এই অবস্থায় আজ আর আপনাকে পড়াতে হবে না—

পণ্ডিত মশাই-এর মুখটা তখন কেমন যেন থরথর করে কাঁপছে।

বললেন—কিন্তু ভব, আমার যে আরো দুটো ক্লাশ আছে—তার কী হবে?

ভবরঞ্জন বললে—সে আমি ব্যবস্থা করবোখন পণ্ডিত মশাই। তার জন্যে আপনি ভাববেন না, আপনি বাড়ি যান—

পণ্ডিত মশাই বললেন—কিন্তু তা কী করে হয় ভব, যে গেছে সে তো গেছে, সে তো আর ফিরবে না, কিন্তু ছেলেদের তো আজকের দিনটা নষ্ট হয়ে যাবে।

তারপর চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ালেন।

বললেন—তুমি বরং এক কাজ করো ভব, ওই টেলিগ্রামটা বরং তোমার খুড়ীমার কাছে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, খবরটা জানানো ভালো, বলে দিও আমার অবন্তী আর নেই—

বলে নিজের ক্লাশের দিকে চলে গেলেন।

নরেন বললে—ব্যাপারটা শুনে আমি চলে এলুম, আর কিছু জানি না।

বসন্তী বললে—আমি তাহলে একবার খুড়ীমার কাছে যাই, কী বলো?

—যাও—

বলে নরেন নিজেও তৈরি হয়ে নিতে গেল।

তা সে-সব দিনের কথা বলরামপুরের লোকের এখনও মনে আছে। ওই একই মাত্র মেয়ে পণ্ডিত মশাই-এর। সবাই জন্মাতে দেখেছে ওই মেয়েকে। পণ্ডিত মশাই আদর করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন অবন্তী। দেখেশুনে একটা বিয়েও দিয়েছিলেন। বিয়ের সময় বলতে গেলে কোনও সংস্থানই ছিল না গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর।

গোবিন্দ চক্রবর্তী মশাই একটা ভালো বেনারসী নাকি দিয়েছিলেন অবন্তীর বিয়েতে। আর দিয়েছিলেন চারটে গিনি।

বলেছিলেন—চিরসুখী হও মা—

মথুর সা' মশাইও কিছু কম দেননি। গৌর ভট্টাচার্যি মশাইকে ডেকে সব খবরাখবর নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—মেয়ের বিয়েতে কত খরচ হবে আপনার পণ্ডিত মশাই?

গৌর ভট্টাচার্যি বলেছিলেন—তা তো জানি না সা' মশাই—কারো বিয়ে তো আগে দিইনি আমি।

সা' মশাই বলেছিলেন—তা তো বটেই। তবু একটু কিছু আন্দাজ আছে তো যে আপনার কত খরচ হতে পারে—কিংবা কত খরচ করতে পারেন আপনি?

গৌর ভট্টাচার্যি বলেছিলেন—আমার কিছুই সংস্থান নেই সা' মশাই। আমি, বলতে পারেন, একেবারে সম্পূর্ণ নিঃস্ব। সম্পত্তি বলতে আমার গৃহিণীর একগাছা দশ ভরির হার ছিল আর তিন ভরির এক জোড়া বালা, তা পাঠশালা করবার সময় তো আমি সে-সবই দিয়ে দিয়েছি, এখন তো আর আমার কিছুই নেই—

মথুর সা' মশাই সদাশয় মানুষ ছিলেন।

[illegible]—তবু কত টাকা হলে আপনার চলবে বলুন?

পণ্ডিত মশাই বলেছিলেন—আমার দরকার শুধু এক ফালি রাঙা সুতো, তাই-ই দু'ভাগ করে দু'হাতে বেঁধে দেবো।

হেসেছিলেন মথুর সা' মশাই।

বলেছিলেন—তা তো হয় না পণ্ডিত মশাই। আপনি না-হয় তাই দিলেন, কিন্তু আপনার মেয়ে? আপনার মেয়ের তো সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে?

বলে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—ঠিক আছে, আপনি বাড়ি যান, অন্য দিকের যোগাড়-যন্তর সব করুন গে, আপনার মেয়ের বিয়ের ভার আমরা সবাই মিলে নিয়ে নিলাম। আপনি বলরামপুরের ইস্কুলের পণ্ডিত, আপনার মেয়ের বিয়ে মানে আমাদেরই মেয়ের বিয়ে। এখন যান, গৃহিণীকে বাড়িতে গিয়ে ভাবতে বারণ করুন গে—

বলে গৌর ভট্টাচার্যি মশাইকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই মেয়েরই কিনা মৃত্যু হলো। এ যেমন আকস্মিক, তেমনি মর্মান্তিক। স্কুল থেকে শেষ ক্লাশ পর্যন্ত করে গৌর ভট্টাচার্যি আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে গেলেন। ততক্ষণে সংবাদ পেয়ে গৃহিণী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আশপাশ থেকে খবর পেয়ে অনেকেই এসে গেছে। পণ্ডিত মশাই বাড়ি ঢুকতেই সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকালো।

বললে—আপনি এতক্ষণ ইস্কুলে ছিলেন কেন পণ্ডিতমশাই। খুড়ীমাকে দেখবার কেউ নেই।

পণ্ডিত মশাই দাওয়ার উপরে উঠে বসলেন। বললেন—সবই মায়া নরেন। গীতায় ভগবান বলেছেন, একমাত্র ব্রহ্মই সৎ; বস্তু আর প্রকৃতির যা কিছু দৃশ্য প্রপঞ্চ সবই অসৎ, সবই অসৎ, তার পারমার্থিক কোনও সত্তা নেই। আমি ভেবে ভেবে চোখের জল ফেলে কী করবো বলো?

কথাটা ভালো। ভাবলে ওর চেয়ে বড় কথা আর নেই।

নরেন আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে—কী, হয়েছিল কী?

পণ্ডিত মশাই বললেন—জামাই লিখেছিল আমাকে, মেয়ের

শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। তা ভাবছিলাম আমি একবার যাবো। মেয়েকে আর নাতিকে এখানে নিয়ে আসবো। কিন্তু এই যাবো যাবো করে আর যাওয়া হচ্ছিল না—

মথুর সা' মশাই-এর ছেলে নিমাই সা'ও এসেছিল।

—আপনি একবার যাবেন নাকি সেখানে ?

পণ্ডিত মশাই বললেন—আর গিয়ে কী করবো বাবা, আমি সেখানে গেলে তো আর আমার মেয়ে ফিরে আসবে না!

নরেন জিজ্ঞেস করলে—জামাই-এর বাড়িতে কে কে আছে ?

পণ্ডিত মশাই বললেন—সংসার বলতে ওই দু'জনই ছিল। আর নাতিটা। এখন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। নাতিকে এখানে নিয়ে এলে জামাই একেবারে একা—

গৃহিণীর পাশে বসে বাসন্তী পাখার বাতাস করছিল।

একবার মুখের কাছে মুখ এনে ডাকলে—খুড়ীমা, তক্তপোষের ওপর উঠে শোও—

রানী যেন বোবা হয়ে গেছে সব দেখেশুনে। সেই ছোটবেলায় চারদিকের শোকের শান্তসমাহিত রূপ দেখে তার মুখে যেন কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিকেল থেকেই।

বললে—মা, ফটিক এখানে চলে আসবে বুঝি ?

বাসন্তী বললে—তুই থাম তো, আর বকবক করিসনি—

শিবানী এবার নড়ে উঠলো যেন। যেন তার কানেও কথাটা গিয়েছিল। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে রানীকে হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিলেন। বললেন—ওকে বোক না বৌমা, ও কি কিছু বোঝে ?

তারপর রানীকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

পণ্ডিত মশাই-এর মেয়ের মৃত্যুতে কিন্তু বলরামপুরের ইস্কুল থেমে থাকেনি। কারণ পণ্ডিত মশাই ইস্কুলকে থেমে থাকতে দেননি। কারোর জন্যেই কোনও কিছু কাজ থেমে থাকে না সংসারে। পরের দিন যথারীতি পণ্ডিত মশাই আবার ইস্কুলে গিয়ে হাজির।

জনার্দনও অবাক।

জনার্দনও বললে—আজকে পণ্ডিত মশাই ইস্কুলে না এলেই পারতেন—

ভবরঞ্জনের ঘরে দৌড়ে গেছে অনিলেশ।

—হেডমাস্টার মশাই, পণ্ডিত মশাই আজকেও ইস্কুলে এসেছেন—

ভবরঞ্জন খবরটা শুনে তাড়াতাড়ি এসে হাজির হলো। দেখলে, গৌর ভট্টাচার্যি মশাই তখন বকাবকি করছেন—কই জনার্দন, ঘণ্টা দিলে না?

জনার্দন ঘণ্টা ঠিক সময়ে দিতই। কিন্তু তবু রোজকার মত সব কাজেই যেন পণ্ডিত মশাই-এর তাড়াহুড়ো।

—গেট বন্ধ করে দাও, গেট বন্ধ করে দাও জনার্দন—

গেট বন্ধ করার পরেই সমস্ত স্কুলের ছেলেরা যার-যার ক্লাশের ভেতর দাঁড়িয়ে সুর করে স্তোত্র পাঠ করতে লাগলো—

জগদুদ্ভব পালন নাশকরং…

প্রণমামি শিবম্ শিব কল্পতরুম…

এ-স্তোত্র ইস্কুলের পত্তনের শুরু থেকেই সবাইকে পাঠ করতে হতো। এ নরেন যখন ছোট ছিল তখনও পড়েছে, ওই নিমাই সা'ও পড়েছে। ভবরঞ্জন পড়েছে। বিন্নুর মা'র ছেলে বিনোদ, এখন যে হাকিম হয়েছে সেও পড়েছে। এ-পড়া বরাবরের নিয়ম এ-ইস্কুলে।

পণ্ডিত মশাই বলতেন—এ পাঠ করা ভালো হে, ভগবানের নাম নিয়ে প্রতিদিন লেখাপড়া আরম্ভ করা ভালো—

ওদিকে স্তোত্রপাঠ চলেছে প্রত্যেক ক্লাশে, আর পণ্ডিত মশাই

তখন একেবারে গেটের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছেন।

—এ্যাই, তোর দেরি হলো কেন রে? দেরি হলো কেন? এই এখন তোর সাড়ে দশটা বাজলো?

একজন বললে—আমার জ্বর হয়েছিল স্যার কাল—

—জ্বর? তা কাল জ্বর হয়েছিল তো আজ ইস্কুলে এলি কেন?

—আজ্ঞে, না এলে যে আপনি বকবেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন—দেখি কপাল দেখি—

গেটের বাইরে হাত বাড়িয়ে ছেলেটার কপাল ছুঁয়ে দেখলেন। তখনও গা গরম রয়েছে।

এক ধমক দিলেন ছেলেটাকে। বললেন—এখনও তো জ্বর রয়েছে তোর। যা, বাড়ি যা, ইস্কুল করতে হবে না, যা। আগে নিজে বাঁচলে তবে তো লেখাপড়া করবি। মরে গেলে লেখাপড়া শিখবে কে রে? আগে স্বাস্থ্য না আগে লেখাপড়া—

ছেলেটাকে আর ঢুকতে দিলেন না। মাথা নিচু করে সে চলে গেল।

—এবার তুই? তোর কেন দেরি হলো?

এমনি করে প্রত্যেকটি ছেলেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে তবে ঢুকতে দিলেন।

তারপর সেই শশধর। শশধর সরকার সেদিনও লেট।

বললেন—ছিঃ শশধর, তুমি রোজ দেরি করবে? তোমরা যদি ছাত্রদের সামনে এমনি করে দেরি করে আস তো কাদের দেখে তারা শিখবে বলো তো?

শশধর সরকারের লজ্জা নেই। গেটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই পণ্ডিত মশাই বললেন—তোমাদের জন্যে যে ছাত্রদের কাছে আমার নিজের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। তুমি কী! একটু সকাল-সকাল ইস্কুলে এলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

ইস্কুলের ভেতরে ঢুকতেই টিচার্স কমোন-রুমে বাঙলার টিচার

গিরীশ দাস বললে—কী শশধরবাবু, পণ্ডিত মশাই ধরে ফেলেছেন তো ?

শশধরবাবু তখন পাখার তলায় দাঁড়িয়ে গায়ের ঘাম মারছে।

বললে—আরে রেখে দাও—পণ্ডিত মশাইও বললেন, আর আমিও শুনলাম, মামলা চুকে গেল। কাল মেয়ে মারা গেছে পণ্ডিত মশাই-এর, আর আজ ঠিক টাইমে ইস্কুলে এসেছে। পাগলের কাণ্ড। বলিহারি নেশা বাবা। পাঁড় মাতালও এক-একদিন নেশা করতে ভুলে যায় হে, এ পণ্ডিত মশাই যে দেখছি পাঁড় মাতালেরও বেহদ্দ—

পণ্ডিত মশাই তখন একেবারে সোজা ভবরঞ্জনের ঘরে গিয়ে হাজির। একখানা কাগজে যারা যারা দেরি করে এসেছে তাদের নাম দাখিল করে বললেন—এই নাও, আজকে এরা লেট, এদের ডেকে তুমি জেরা করো—

তারপর বললেন—এরকম না করলে তুমি ইস্কুল চালাতে পারবে না ভব, আমি যখন হেডমাস্টার ছিলুম তখন তোমাদের বেলায় এইরকম করেছি ; এখন তুমি হেডমাস্টার হয়েছ, এখন তোমাকেও এই রকম করতে হবে। আর যদি তা না করো তো আমার এত কষ্টে গড়া ইস্কুল, এ গোল্লায় যাবে তা বলে রাখছি—

ভবরঞ্জন কাগজটা নিয়ে মাস্টার মশাই-এর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বললে—আজকে কেন আপনি ইস্কুলে আসতে গেলেন পণ্ডিত মশাই, আপনার বাড়িতে এত বড় বিপদ···

কিন্তু সেসব কথা তখন কানে দেবার সময় নেই পণ্ডিত মশাই-এর। ওদিকে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে তাঁর। জালায় ছেলেদের খাবারের জল ভরা হয়েছে কিনা দেখতে হবে। কোন কোন মাস্টার আজকে আসেনি তাদেরও হাজরে খাতা দেখতে হবে। অনেক কাজ পণ্ডিত মশাই-এর। যেদিকে তিনি না দেখবেন সেই দিকেই তো গণ্ডগোল···

তিনি ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

তা জামাই একদিন নাতিকে নিয়ে এসে হাজির। কোথায় দিলদারপুর—সেখানকার জামাই। জামাইকে দেখে খুব কান্নাকাটি করলে শিবানী।

নিশাপদ বললে—আর কেন কাঁদছেন মা, কাঁদলে তো আর মানুষ ফিরবে না। বৃথা কাঁদা—

মানুষ গেলে মানুষ আর আসে না। কিন্তু সংসার তো আর তা বলে কারো জন্যে হা-পিত্যেস করে বসে থাকে না। তাকে রান্না করতে হয়, খেতে হয়, লোক-লৌকিকতা সমস্ত কিছুই করতে হয়।

নিশাপদ একটা দিন ছিল।

ফটিক বললে—দিদ্‌মা, সুশীল আছে? রানী আছে?

দিদিমা বললে—হ্যাঁ বাবা, সবাই আছে—

—আমি সুশীলদের বাড়ি যাবো—

কিন্তু তাদের বাড়ি আর যেতে হলো না। সুশীল খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছে। বললে—এমা, ন্যাড়া মাথা—

রানী এক চড় মারলে সুশীলকে। বললে—ছিঃ, ও কথা বলতে আছে? ওর মা মারা গেছে না।

ফটিক বললে—হ্যাঁ, সুশীলটা বোকা, কিচ্ছু বোঝে না। মা মারা গেলে ন্যাড়া হতে হয় না বাবা

নিশাপদ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই খুব চালাক। এখন দিদিমাকে জিজ্ঞেস কর দিকিনি এককাপ চা হবে কি না—

ফটিক দৌড়ে গেল রান্নাঘরে। বললে—দিদ্‌মা, বাবাকে চা দেবে না?

চা। দিদিমা নিজের শোকেই অস্থির। জামাই-এর জলখাবারের বন্দোবস্তই করছিল। কিন্তু চায়ের কথা মাথায় আসেনি। তাড়াতাড়ি ছুটলো বাসন্তীদের বাড়ি।

বৌমা, তোমাদের চা আছে, আমার জামাই চা খায় সে কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম—

বাসন্তী বললে—তুমি ব্যস্ত হোয়ো না খুড়ীমা, আমি চা করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তা বৌমা ছিল বলে সে-যাত্রা রক্ষে হলো। ততক্ষণে ফটিক বেরিয়ে গেছে বাগানের ধারে।

নিশাপদ চিৎকার করে ডাকলে—এই ফটকে—

ডাকটা কানে যেতেই ফটিক বললে—ওই বাবা ডাকছে—আমি যাই ভাই—

—কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ ?

বলেই চারদিক দেখেশুনে নিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করলে। বললে—একটা দেশলাই যোগাড় করতে পারিস—

রান্নাঘরে গিয়ে ফটিক দিদিমার কাছে গিয়ে বললে—দিদ্‌মা, দেশলাই দাও, বাবা সিগারেট খাবে—

কথাটা কানে গিয়েছিল নিশাপদর।

বললে—দূর হাঁদা, দিদ্‌মাকে বলতে আছে আমি সিগ্রেট খাই—

ফটিক বললে—দাও বাবা, চা দাও আমাকে, আমি চা খাবো—

ডিসের ওপর একটুখানি চা ফেলে নিশাপদ বললে—খা, কাপড়ে ফেলিসনে, খেয়ে নে—

পণ্ডিত মশাই হঠাৎ ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশাপদ সিগারেটের ধোঁয়াটা হাতের পাতা দিয়ে সরাতে সরাতে ফটিককে বললে—ওই তোর দাদু আসছে, ওঠ ওঠ—

কিন্তু পণ্ডিত মশাই-এর দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায়নি। জামাই-এর

সিগারেট খাওয়াও তাঁর ভালো লাগেনি, ফটিকের চা খাওয়াও তাঁর খারাপ লেগেছে।

—কেমন আছ নিশাপদ? রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো?

নিশাপদ বললে—আমার ঘুমের রোগটোগ নেই, আমি বিছানায় একবার পড়বো আর ঘুমোব—

পণ্ডিত মশাই বললেন—ফটিককেও কি চা খাওয়া ধরিয়েছ নাকি?

নিশাপদ বললে—আপনার মেয়েও চা খেত, এই বেটাকেও সে চা ধরিয়ে গিয়েছিল।

—লেখাপড়া কিছু শিখেছে-টিখেছে এ?

নিশাপদ বললে—লেখাপড়া? রামঃ, আমার কথাই তো শোনে না। দিলদারপুরে তো আমায় কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়, ছেলের লেখাপড়া দেখবো কখন?

ফটিক বলে উঠলো—আমি দ্বিতীয় ভাগ পড়তে পারি দাদু—

—তুই থাম, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না। আপনার মেয়ে তো কিছু দেখতো না কিনা, আর আমারও মরবার ফুরসত ছিল না, তাই একেবারে বখাটে মার্কা হয়ে গেছে। দিলদারপুর জায়গাটাও তো ভাল না—

পণ্ডিত মশাই বললেন—এবার ওকে এখানেই রেখে যাও, আমি দেখবো ওকে—

—তাই ভালো, আপনার কাছে থাকলে শাসনে থাকবে, হারামজাদা আমার কথা একেবারে শুনতেই চায় না—

যাবার সময় নিশাপদ শাশুড়িকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

শিবানীর চোখ দিয়ে তখন ঝরঝর করে জল পড়ছিল। একমাত্র মেয়ে শিবানীর। বিয়ের পর থেকে একমাত্র অবলম্বন বলতে গেলে। কত কষ্টে কত যত্নে কত পরিশ্রমে যে অবন্তীকে মানুষ করেছিল শিবানী তা পণ্ডিত মশাই কেন, কেউই জানতে পারেনি। এই বলরামপুরে সবাই পণ্ডিত মশাইকেই চেনে, কিন্তু তাঁর আড়ালে

আর একজন মানুষের অস্তিত্বের গুরুত্বটুকু কারোর মাথাতেই কোনও দিন উদয় হয়নি।

নিশাপদ বললে—কাঁদবেন না, কেঁদে আর কী করবেন মা, আমি তো তার চিকিৎসার কোনও ত্রুটি করিনি—ওষুধে-ডাক্তারেই প্রায় পাঁচশো তেরো টাকার মতন ফালতু খরচ হয়েছে, আমি হিসেব রেখেছি সব—

এর উত্তর আর কী-ই বা দেবে শিবানী।

শুধু বললে—আমাদের যদি একটু আগে থেকে জানাতে বাবা, আমরা না-হয় যেতাম—

নিশাপদ বললে—গেলে কলা হতো! মিছিমিছি পয়সার শ্রাদ্ধ হতো, আর ডাক্তার শালারা দু'হাতে টাকা লুটতো—

—তবু তো বাপ-মায়ের প্রাণ বাবা, একবার শেষ দেখা দেখতে পেতাম!

নিশাপদ বললে—মোটে সময় দিলে না যে! আপনার মেয়ে কি আপনার কথা ভাবতো কখনও? বড় বেয়াড়া স্বভাব ছিল যে তার! আমি যতবার বলতাম তুমি আমার জন্যে উপোস করে বসে থেকো না, কিন্তু তা কি শুনবে? তাই করে করেই তো পেটে আলসার বাধিয়ে বসলো—

বলে নিশাপদ পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

বললে—বাবার সঙ্গে আর দেখা হলো না, তাঁকে বলে দেবেন—

মথুর সা' যখন জমি দিয়েছিলেন, টাকা দিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন—গৌর, তুমিই এর ফাউণ্ডার হও, তুমিই এর প্রতিষ্ঠাতা হও—

ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান গোবিন্দ চক্রবর্তীও তাই বলেছিলেন।

বলেছিলেন—আমরা হলাম গিয়ে ইস্কুলের পেট্রন, আসলে তুমিই তো প্রতিষ্ঠাতা—

কিন্তু গৌর ভট্টাচার্যি বলেছিলেন—আজ্ঞে, ওসব বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে আমাকে আর জড়াবেন না সা' মশাই, আমি ছেলেদের শিক্ষা দিয়েই আমার কর্তব্য শেষ করবো—

তা সেই রকমই দলিল তৈরি হলো। গোবিন্দ চক্রবর্তী আর মথুর সা' মশাই দু'জনে বংশ পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে ফাউণ্ডার ট্রাস্টি থাকবেন; আর গৌর ভট্টাচার্যি মশাই হবেন হেডমাস্টার।

গৌর ভট্টাচার্যি বলেছিলেন—আপনারা রইলেন আমার মাথার ওপর, সেই-ই আমার বড় ভরসা—বিপদে-আপদে আপনারাই থাকবেন কর্ণধার। আমি আপনাদের পায়ের তলায় বসে কাজ করে যাবো—

তা শুধু দু'জনের টাকায় কি এত বড় স্কুল হয়? এই গৌর ভট্টাচার্যি মশাই ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে কতবার মেলায় গিয়েছেন ঝুলি কাঁধে করে।

মেলার লোকদের বুঝিয়ে বলেছেন—তোমরা প্রত্যেকে একখানা করে ইটের দাম দাও, একখানা ইটের দাম দু'পয়সা। দু'পয়সা দিলেই আমার পাঠশালা হবে—দাও, মাথাপিছু দুটো করে পয়সা দাও তোমরা—

তখন ওই অবন্তী সবে হয়েছে। মেয়ে কোলে করে শিবানী সারাদিন পথ চেয়ে বসে থেকেছে কর্তার জন্যে। কর্তা সেই ভোর বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, আর দুটো মুড়ি-চিঁড়ে খেয়ে সারা দিনটা বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন।

রাত্তির বেলা যখন তিনি বাড়িতে ফিরেছেন তখন সঙ্গে এক ঝুলি পয়সা।

—হ্যাঁ গো, এত পয়সা কীসের—

গৌর ভট্টাচার্যি বলেছেন—তুমি মেয়েমানুষ এসব বুঝবে না—

শিবানী বলেছে—আমি না-হয় নাই বুঝলাম, কিন্তু আমি একলা এই মেয়েটাকে কোলে করে সারাদিন কাটাই কী করে বলো দিকিনি—ক'দিন থেকে ওর ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে—

—জ্বর হচ্ছে তা কবিরাজ মশাইকে ডেকে পাঠাওনি কেন? একটা পাঁচন খাইয়ে দিত—

—কে ডাকবে? আমি ডাকতে যাবো?

—তা তুমি ডাকতে না পারো পাড়ায় পাঁচজন লোক আছে, তাদেরও তো খবরটা দিলে পারো। আর অত যদি ভাবনা ছিল তো আমাকে আগে থেকে জানালে জনার্দনকেও আমি বলতে পারতুম—।

শিবানী বলতো—তুমিও তো একটু দেখবে! এ তোমারও তো মেয়ে—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই রেগে যেতেন। বলতেন—তা আমার কি একটা কাজ? আমি পাঠশালা দেখবো না তোমার মেয়েকে সামলাবো? এই পাঠশালাটা যখন বড় হবে তখন যে হাজারটা ছেলের উপকার হবে, তা বুঝছো না?

সেই অত রাত্তিরে বাড়ি ফিরে এসে তখন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই সেই খুচরো পয়সাগুলো গুনতে বসতেন, এক এক করে। আধলা-পয়সা মিলিয়ে কোনও দিন পাঁচ টাকা, আবার কোনও দিন বা সাত টাকা হতো। আবার খুব বেশি হলো তো দশ টাকা।

পরদিন সকাল বেলা আবার সেই টাকা আনা পাই পয়সার নিখুঁত হিসেব দিয়ে আসতেন 'বলরামপুর ভ্যারাইটি স্টোর্স'র মালিক মথুর সা'র গদিতে। মথুর সা' তখন স্কুলের প্রেসিডেন্ট আর গোবিন্দ চক্রবর্তী মশাই হলেন সেক্রেটারি।

মথুর সা' জিজ্ঞেস করতেন—আজ কত হলো গৌর?

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—আজ বেশি হলো না সা' মশাই, মোটে সাত টাকা তের আনা—

সা' মশাই বলতেন—যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট—

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—না সা' মশাই, ওতে হবে কী করে? আরো তিনখানা কামরা তুলতে হবে। তিনখানা কামরা তুলতে অন্তত তিন হাজার টাকা বেকসুর লাগবে—

সা' মশাই টাকা পয়সাগুলো ক্যাশ-বাক্সে তুলতে তুলতে বলতেন—তুমি নিজের কাছে একটা হিসেব রাখছো তো গৌর?

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—আমার কাছে আবার হিসেব কী রাখবো সা' মশাই, আমি হিসেবের কী বুঝি? আমি পাণিনি বুঝি, কাব্য বুঝি, অলঙ্কার বুঝি। আমার মাথায় কি ওসব হিসেব ঢোকে?

বাড়িতে এসে দেখতেন তখন রান্না হয়নি গৃহিণীর—

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—কী গো, এখনও রান্না হয়নি?

শিবানী তখন রান্না নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। বলতো—রান্না হবে কী করে? এক হাতে মেয়ে আর এক হাতে রান্না, আমি কোন্ দিক সামলাই?

গৌর পণ্ডিত বুঝতেন। বলতেন—না, মেয়ে ধরবার জন্যে একজন লোক ঠিক করতে হবে দেখছি—

শিবানী বলতো—আমি ম'লে তুমি লোক ঠিক করবে। তুমি আগে তোমার পাঠশালা সামলাও—

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—না না, আমাকে একটু সুস্থির হতে দাও, একটা লোকের ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে দেখছি—

এসব পুরোনো ব্যাপার। কিন্তু ওই ফটিককে কোলে নিয়ে থাকতে থাকতে আবার সেইসব দিনের কাহিনীগুলো মনে পড়তে লাগলো শিবানীর। কী করে যে মেয়েকে মানুষ করেছিল, আর কী

করে যে আবার সেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল তা শুধু শিবানীই জানে আর জানে তার ভগবান।

মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি সোজা কাজ!

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর স্কুল তখন পুরো দমে চলছে। একদিকে টাকার অভাব, অন্যদিকে ছেলেদের পড়াশোনা দেখা। পাত্র খোঁজবার সময় নেই।

শিবানী একদিন বললে—কই গো, অবন্তীর বিয়ের তুমি কিছু করলে না?

গৌর ভট্টাচার্যির যেন মনে পড়ে গেল।

বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, করবো। এই ছেলেদের পরীক্ষাটা হয়ে যাক—

শিবানী বললে—তা পরীক্ষা তো সারাজীবনই চলবে, মেয়ের বিয়ে তো আর তা বলে বসে থাকবে না—

গৌর ভট্টাচার্যি তখন একমনে ছেলেদের খাতা দেখছিলেন।

বললেন—এখন বিরক্ত কোর না, খাতা দেখছি, ভুল হয়ে যাবে—

শিবানী বললে—তাহলে মেয়ে তোমার আইবুড়োই থাক চিরকাল—

যখন ক্রমেই ব্যাপারটা খুব ঘোরালো হয়ে উঠলো তখন আর চুপ করে থাকা চললো না। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে বললেন—তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি গো—

শিবানী বললে—কী রকম পাত্র?

—পাত্র খুব ভালো গো, ব্যবসা করে। স্বাধীন। নিজের পৈতৃক বাড়ি আছে।

—বাবা-মা?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না, ওসব ঝঞ্ঝাট কিচ্ছু নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা।

—তুমি পাত্রকে দেখেছ?

—দেখিনি, তবে দেখবো। পাত্র নিজের চোখে না দেখে কি আর বিয়ে দেবো?

—মেয়ে দেখবে কে ?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—মেয়ে কেউ দেখবে না। পাত্র নিজে বলেছে, বলরামপুর স্কুলের হেডমাস্টার মশাই-এর মেয়ে, তার আবার দেখার কী আছে ? তাঁর মত পণ্ডিত ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করতে পারছি এই-ই আমার কপাল।

—ওই কথা বলেছে পাত্র ?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—হ্যা গো হ্যাঁ, বলেছে। শুনে বড় খুশী হয়েছি। আমার নাম তো এখন চারদিকে ছড়িয়ে গেছে কি না। বলরামপুর হাই ইস্কুল-এর চারদিকে আমার কত সুখ্যাতি জানো ? তিনবার বৃত্তি পেয়েছে আমার ছাত্র, নাম হবে না ?

সেই পাত্র একদিন বিয়ে করতে এল। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান গোবিন্দ চক্কোত্তি এলেন। বলরামপুর ভ্যারাইটি স্টোর্সের মথুর সা'ও এসেছিলেন। পাত্রের কেউ নেই। বরযাত্রীরা একদল এসেছিল সঙ্গে। তারা এসেই হুল্লোড় বাধিয়ে দিলে। খেলেও খুব গাণ্ডেপিণ্ডে।

মথুর সা' তদারক করছিলেন নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

বললেন—বাবাজীরা চেয়ে-চিন্তে খাবে। কেউ লজ্জা কোরো না—

তারা লজ্জা করবারই লোক বটে! যত দেওয়া হয় তত চায়। চাইতে তাদের লজ্জা নেই।

বলতে লাগলো—আরো দুটো মোণ্ডা দাও ভাই—

কেউ বললে—বেড়ে মাছের কালিয়া হয়েছে তো, বেশ বড় বড় দেখে দুটো মাছের দাগা দাও দিকিনি—

সে রাত্রে গৌর ভট্টাচার্যির যে ইজ্জত বাঁচালো তা পণ্ডিত মশাই-এর জন্যে নয়, ওই মথুর সা' আর গোবিন্দ চক্কোত্তি মশাই-এর জন্যে। বরযাত্রীরা যত না খায় তার চেয়ে নষ্ট করে বেশি। আর যত আপ্যায়ন পায় কন্যাকর্তার বাড়ি, কন্যাকর্তাকে তত বেশি অপদস্থ করতে চায়।

শেষকালে মথুর সা' বললেন—আমার দোকান থেকে ঘি আনো, ময়দা আনো, দেখি ওরা কত খেতে পারে—

শুধু কি আর ঘি-ময়দা? ছানা এল, চিনি এল। সেই রাত্রেই আবার নতুন করে মিষ্টি তৈরি হলো। পুকুর থেকে মাছ ধরে কোটা হলো, ভাজা হলো, রান্না হলো। ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বরযাত্রীরা দেখে বললে—হ্যাঁ, ভদ্রলোক আছে বটে বলরামপুরে। একজনের অপমান সকলের অপমান, একজনের মর্যাদা সকলের মর্যাদা।

সেদিন গৌর ভট্টাচার্যির মেয়ে অবন্তীর বিয়েতে সবাই প্রাণপণে, পণ্ডিত মশাই-এর বিপদে বুক পেতে দিয়েছিল। সেসব কথা বলরামপুরের লোকেরা কি ভুলতে পারে?

নিশাপদ যাবার সময় বলেছিল—আপনি ফটিককে এখানে রাখছেন বটে, তবে ঠেলাটা বুঝবেন।

শিবানী অবাক হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে।

জিজ্ঞেস করেছিল—কেন বাবা? ও তো আমার খুব শান্ত ছেলে—

নিশাপদ বলেছিল—শান্ত? দেখবেন শান্ত কী রকম। এখনি আমার হাত থেকে সিগ্রেট টেনে নিয়ে খেতে শিখেছে, এর পর বড়-কলকে না ধরে—

—বড়-কলকে মানে?

শিবানী কথা ঠিক বুঝতে পারেনি।

নিশাপদ বুঝিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—বড়-কলকেও চেনেন না? বড়-কলকে মানে গ্যাঁজা। ও বেটা বড় হলে নির্ঘাত গ্যাঁজা টানতে শিখবে। ভদ্দরলোকের বংশে কুলাঙ্গার হয়ে জন্মেছে—

শিবানী মনে মনে শিউরে উঠেছিল জামাই-এর কথা শুনে। বলেছিল—তা বাবা, ওকে একটু ভালো শিক্ষা-দীক্ষা দাওনি কেন তুমি?

নিশাপদ বলেছিল—আরে, আমি আমার কারবার দেখবো, না আমার ছেলে সামলাবো? আপনার মেয়ে যে কোনও কম্মের ছিল না, আপনার মেয়ে যদি ফটিককে দেখতো তো আজ ওই দশা হয়!

—তা তুমি অবন্তীকে দেখতে বললেই পারতে?

নিশাপদ বলেছিল—তা হলেই ঝগড়া। যা ঝগড়াটে ছিল আপনার মেয়ে! আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে, না ছেলেকে সৎ শিক্ষা দেবে?

এসব কথায় যা বোঝবার তা শিবানী বুঝে নিয়েছিল। চোখের জলের সঙ্গেই বুঝে নিয়েছিল।

কিন্তু গৌর ভট্টাচার্যি বলেছিলেন—না, ঠিক আছে, আমার এখানেই ফটিককে রেখে যাও। আমিই ওকে মানুষ করবো—

খুব ভালো কথা। আপনাদের নাতি আপনারা মানুষ করবেন, তাতে আমার আর কী বলবার আছে!

সেই যে নিশাপদ ফটিককে রেখে চলে গিয়েছিল, আর একবারও এ-মুখো হয়নি।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই সেইদিন থেকেই লেখাপড়া শেখাতে শুরু করে দিয়েছিলেন ফটিককে।

প্রতিদিন ভোর বেলা গৌর ভট্টাচার্যি মশাই নিজের বাড়ির দাওয়ায় বসতেন একপাল ছেলে নিয়ে। এমনি করে ওই নিমাই সা'ও একদিন এই দাওয়ায় বসে পড়ে গেছে। রানীর বাবা নরেন চক্রবর্তীও পড়ে গেছে। ওই ভব, ভবরঞ্জনও পড়েছে এইখানে মাটির দাওয়ায় বসে। শিবানী ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে দাওয়ায় গোবর নিকিয়ে দিয়েছে। তারপর দাওয়াটা শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সবাই হাজির হয়েছে শ্লেট-খাতা-বই নিয়ে। কিন্তু তারও অনেক আগে পণ্ডিত মশাই গায়ত্রী পাঠ করে তৈরি হয়ে নিয়েছেন সারা দিনের মত।

—হ্যাঁ রে, কৈলাস কই ? কৈলাস আসেনি আজ ?

বিনু এসেছে, রানী এসেছে, সুশীল এসেছে। রণবীর এসেছে। কেউ আসতে বাকি নেই। শুধু কৈলাস আসেনি। কৈলাস তো এমন করে না। পড়াতে পড়াতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন গৌর ভট্টাচার্যি। কৈলাসটার হলো কী ?

পড়াতে পড়াতে গৌর ভট্টাচার্যি উঠে ভেতরে গেলেন। শিবানী রান্নাঘরে তখন রান্নায় ব্যস্ত।

—ওগো শুনছো ? কোথায় গেলে তুমি ?

শিবানী রান্না করতে করতে পেছন ফিরলো। বললে—কী হলো ?

—ওগো, কৈলাস আসেনি আজ।

শিবানী বললে—কৈলাস আসেনি তা আমি কি করবো ?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না, তাই তোমাকে বলতে এলুম—

—তা আমাকে বলে কী লাভ ? আমি কি কৈলাসকে ডেকে আনতে যাবো ?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—ওই ছাখ, তুমি আবার রাগ করলে। আমি কী এমন রাগের কথা বলেছি ! বলছি যে কৈলাস আসেনি। আর তো কিছু বলিনি তোমাকে। একটা ছেলে রোজ আসে, আজকে এল না। তা ভাবনা হয় না ?

শিবানী রান্না করতে করতেই বললে—কেউ আর আসবে না তোমার কাছে। কেন আসবে ? ছেলেমানুষ সব, অত মারধোর করলে কেউ আসে ?

মারধোর করার কথাটা শুনেই গৌর ভট্টাচার্যি আর দাঁড়ালেন না সেখানে। দাওয়ার ওপর সবাই তখনও ঢুলে ঢুলে পড়ছে। গৌর ভট্টাচার্যি আবার সেখানে গিয়ে নিজের আসনে বসলেন। তা হয়তো হবে। শিবানী যা বলেছে তাই-ই হয়তো ঠিক। কিন্তু কই, ওই তো নরেন পড়েছে, নিমাই পড়েছে, বিনোদ পড়েছে। সবাই তো তাকে দেখলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। তাঁকে ভক্তি

করে সবাই। মারধোরের জন্যে যদি তারা রাগই করতো তাহলে কি এখনও ভক্তি করতো তাঁকে। তাহলে কি এখনও রাস্তায় দেখা হলে পায়ের ধুলো নিত?

তিনি উঠলেন। বললেন—তোরা পড়, আমি আসছি—

বলে উঠলেন। উঠে দাওয়া থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদরের দিকে গেলেন। সেখান থেকে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে চিৎকার করে বললেন—ওগো, শুনছো, আমি একবার বেরোচ্ছি, এখনি আসবো—

ভোর হয়ে সূর্য উঠে গেছে। সামনের পানা-পুকুরটার পাড় ঘেঁষে রাস্তা। রাস্তায় বেরিয়েই কালীর মা'র সঙ্গে দেখা। কালীর মা চোখে দেখতে পায় না ভালো।

—কী গো কালীর মা, এত সকালে কোথায় যাচ্ছ?

পণ্ডিত মশাই-এর গলাটা শুনেই কালীর মা এক গলা ঘোমটা দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকালো।

—থাক, থাক, কালী কেমন আছে? কাজকর্ম কেমন করছে?

কালীর মা'র মুখটা কেমন যেন করুণ হয়ে উঠলো।

বললে—এই বাবাঠাকুর, আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম, আমার নাতিটার জন্যে বলতে এসেছিলুম আপনাকে।

—তোমার নাতি? কালীর ছেলে? কালীর আবার ছেলে হলো কবে? আমি তো কিছু শুনিনি। কোন ক্লাশে পড়ে?

—পড়ে না এখনও বাবাঠাকুর! এইবার ভর্তি করিয়ে দেবো। তা আপনি তো কালীর অবস্থা জানেন, কালী আজকাল নন্দী মশাই-এর আড়তে কাজ করছে। যা মাইনে পায় তাতে দু'বেলা খেতে কুলোয় না। আপনি যদি নাতিটাকে একটু ফিরি করে ছান দয়া-ঘেন্না করে।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তা আমাকে বলছো কেন? ফ্রি করে দেবার মালিক কি আমি কালীর মা?

কালীর মা বললে—আজ্ঞে, ইস্কুল তো আপনার, আপনিই তো ইস্কুল গড়েছেন।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—ওসব ফ্রি-টি আমি করতে পারবো না

যখন ইস্কুল গড়েছি, তখন গড়েছি। এখন ভব রয়েছে হেডমাস্টার নিমাই সা' রয়েছে প্রেসিডেন্ট, নরেন চক্কোত্তি রয়েছে সেক্রেটারি ইস্কুল চালাবার জন্যে কমিটি রয়েছে। তারাই সব করছে, আমি কে? তাদের কাছে যাও—

কালীর মা বললে—না বাবাঠাকুর, ওসব কথা আমি জানিনে লোকে জানে আপনিই সব, এখনও সবাই গৌর পণ্ডিতের ইস্কুলই বলে—আমার নাতিকে ফিরি করে দিতেই হবে—

গৌর পণ্ডিতের মনটা একটু যেন ভিজলো। তা বটে, বলরামপুরের লোক এখনও গৌর পণ্ডিতের ইস্কুলই বলে ওটাকে। কে না জানে পণ্ডিত মশাই স্কুলের জন্যে কীই না করেছেন।

বললেন—আচ্ছা, এক কাজ করো কালীর মা, কাউকে দিয়ে একটা দরখাস্ত লিখিয়ে আমাকে দিয়ে যেও, দেখি আমি সেক্রেটারিকে বলে-কয়ে কী করতে পারি—

কালীর মা বললে—আপনি সবই করতে পারেন বাবাঠাকুর—ইচ্ছে করলেই সব করতে পারেন—

বলে কালীর মা আবার গড় হয়ে গৌর ভট্টাচার্যিকে প্রণাম করলে। তারপর যেদিক দিয়ে এসেছিল আবার সেইদিকেই চলে গেল।

তা ভবরঞ্জনও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেক্রেটারি নরেন চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্ট নিমাই সা'—তারা দু'জনেও অবাক।

ভবরঞ্জনই দেখালে—এই দেখুন—

সেক্রেটারি নরেন চক্রবর্তী দেখলে। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই

তার নাতিকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। [illegible]চন্দ্র হালদার, পিতা শ্রীনিশাপদ হালদার। কেয়ার অব—স্থানীয় অভিভাবক শ্রীগৌরচন্দ্র ভট্টাচার্যি, কাব্যতীর্থ। বলরামপুর, দক্ষিণপাড়া।

নরেন চক্রবর্তী বললে—তা তুমি ফ্রি করে নিলে না কেন ভব? তুমি জানো পণ্ডিত মশাই-এর আর্থিক অবস্থা। মাসে মাসে সাড়ে সাত টাকা তিনি কোত্থেকে দেবেন?

নিমাই সা' বললে—তা ওর বাপ তো বেঁচে আছে, বাপ কি আর ছেলের পড়ার খরচা মাসে মাসে শ্বশুরের কাছে পাঠাচ্ছে না?

নরেন চক্রবর্তী বললে—না হে নিমাই, সে এক হতচ্ছাড়া জামাই। ছেলেকে শ্বশুরের কাছে রেখে সেখানে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে—। আমি তো পণ্ডিত মশাই-এর কাছে সে-সব শুনেছি।

ভবরঞ্জন বললে—তাও আমি বলেছিলুম। বলেছিলুম—পণ্ডিত মশাই, আপনি আর নাতির মাইনেটা কেন দেবেন? সেক্রেটারিকে বললেই একে ফ্রি-স্টুডেন্ট করে দিতেন—

—তা, কী বললেন শুনে?

পণ্ডিত মশাই বললেন—না, না, সে কী কথা! দেখছো এখন ইস্কুলের পয়সার এত টানাটানি, দিনকাল খারাপ পড়েছে, তার ওপর ফ্রি-শিপ? মাসে সাড়ে সাত টাকার ব্যাপার, ও আমি যেমন-তেমন করে চালিয়ে নেব ভব। তুমি কিছু ভেবো না—

বলে নিজের ক্লাশের দিকে চলে গেলেন। নিমাই সা' বললে—উনি তো নোট বইটইও লিখবেন না—

ভবরঞ্জন বললে—ওরে বাবা, ছেলেদের হাতে নোটবই দেখলে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। আমি নিজে নোট বই লিখেছি বলে আমার ওপরে খাপ্পা—

নিমাই সা' বললে—পাগল—পাগল—একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হে—

নরেন চক্রবর্তী বললেন—আমি তো আমার ছেলেকে বাড়িতে এসে পড়াতে [illegible]ছিলুম। ভেবেছিলুম এমনিতে তো কিছু সাহায্য

নেবেন না, ছেলে পড়ানোর নাম করে যদি কিছু সাহায্য করা যায়, কিন্তু শুনে আমার ওপরেই রেগে গেলেন—

নিমাই সা' বললে—যাক গে, কত রকমের মানুষ আছে ছুনিয়ায়—

বলে অন্য প্রসঙ্গ তুলে বললে—আসছে বুধবার একটা মিটিং ডাকো হে, ইস্কুলের বিলডিং-এর ব্যাপারটার একটা ঠিক করতে হবে। তারপর টিচারদের পে বাড়াবার জন্যে যে জয়েণ্ট দরখাস্ত এসেছে, সেটারও একটা হিল্লে করতে হবে—

বলরামপুর ইউনিয়নের মাথা হলো নিমাই সা'। বাপের 'বলরামপুর ভ্যারাইটি স্টোর্স' দিয়ে শুরু। ডালটা, চালটা, কেরোসিন তেলটা থেকে তারপর আস্তে আস্তে সবই এসেছে। বাপ মথুর সা'র টাকা ছিল বটে, কিন্তু নিজে ছিল ধর্মভীরু মানুষ। টাকা যেমন এসেছে, কারবার যেমন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, তেমনি আবার দান-ধ্যানও করেছে সঙ্গে সঙ্গে। শেষের দিকে তাই গ্রামের মানুষের কিছু ভালো করবার সদিচ্ছে হয়েছিল তার। সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল গোবিন্দ চক্রবর্তী মশাইকে। ইস্কুলের বাড়ির জন্যে যেমন জমি দিয়েছিল, তেমনি অনেক বর্ধিষ্ণু লোককে টাকা দিয়ে শক্তি দিয়ে সাহায্য করতেও বলেছিল। মথুর সা'র কথাতেই আরো অনেক লোক ইস্কুলের কাজে সামনে এগিয়ে এসেছিলেন। আগে ছু'মাইল দূরে কদমতলার ইস্কুলে বলরামপুরের ছেলেরা পড়তে যেত। বর্ষায় কাদা মাড়িয়ে গ্রীষ্মের কাঠ-ফাটা রোদে মাথা পুড়িয়ে হয়রান হয়ে যেত ছেলেরা। যখন বলরামপুরে ইস্কুল হলো তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো এখানকার ছেলেরা।

যখন বন-জঙ্গল সাফ করে বাড়ি উঠতে লাগলো তখন সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো—এখানে কী হচ্ছে গো ?

মিস্ত্রী মজুর যারা কাজকর্ম করছিল, তারা বলতে লাগলো—গৌর মাস্টারের পাঠশালা।

সেই থেকে ওই নামেই বরাবর চলে আসছে। যখন পাঠশালার নতুন বাড়ির মাথায় বড় বড় করে নাম লেখা হলো—'বলরামপুর হাই স্কুল', তখনও লোকে মুখে মুখে বলতো—গৌর মাস্টারের পাঠশালা। কাগজেপত্রে যা-ই লেখা থাক, লোকের দেওয়া নামটাই চলতো বরাবর।

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—আরে, আমার পাঠশালা বলছো কেন তোমরা ? আমি কি এ ইস্কুলের মালিক ? ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট আছে, সেক্রেটারি আছে, ম্যানেজিং কমিটি আছে, তারাই হলো আসল। আমি কে ? আমার কাছে এসেছো কেন ? তাদের কাছে যাও। ইচ্ছে করলে তারা তোমার ছেলেকে ফ্রি-শিপ করিয়ে দিতে পারে—

শুধু তাই নয়। ছেলে ফেল করেছে, গার্জিয়ান গৌর ভট্টাচার্যির বাড়িতে এসে ডাকাডাকি।

—গৌর ভটচার্যি মশাই, গৌর ভটচার্যি মশাই আছেন ?

রানী বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিত।

সেক্রেটারির মেয়েকে গাঁয়ের লোক সবাই চেনে।

বলতো—কী গো রানী, গৌর ভটচার্যি মশাই কোথায় ? বাড়িতে আছেন ?

রানী বলতো—দাদু নেই—

—গৌর ভটচার্যি মশাই তোমার দাদু ? তুমি তো নরেন চক্কোত্তির মেয়ে।

রানী বলতো—বাবা তো ও-বাড়িতে—

—তাহলে তুমি এ-বাড়িতে কেন ?

রানী বলতো—বারে, আমি এখেনে আসবো না ? এটা যে

আমার দাতুর বাড়ি—দাতু এখন নেই।

বাড়িতে না দেখা হলেও রাস্তায় দেখা হয়ে যায়—

—পেন্নাম হই ভটচার্যি মশাই। আমি কালীপদ। কালীপদ বিশ্বাস।

গৌর ভট্টাচার্যি চিনতে পারেন। বলেন—বুঝেছি, তোমার ছেলে তো ফেল করেছে—

কালীপদ বিশ্বাস বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ পণ্ডিত মশাই, সেইজন্যেই তো এখখুনি আপনার বাসায় গিয়েছিলাম, নরেন চক্কোত্তি মশাই-এর মেয়ে রানী, সেই দরজা খুলে দিলে, বললে—দাতু বাড়ি নেই—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—হ্যাঁ, আমার নাতি—

কালীপদ বিশ্বাস বললে—তা আমার ছেলের জন্যেই আপনার কাছে গিয়েছিলাম, আপনাকে পাশ করিয়ে দিতে হবে পণ্ডিত মশাই, নইলে একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে তার—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তা ফেল যখন করেছে তখন তো একটা বছর নষ্ট হবেই। এবার ভালো করে পড়তে বলো গিয়ে তোমার ছেলেকে—

কালীপদ বিশ্বাস বললে—আজ্ঞে ছেলের দোষ নেই, এগ্জামিনের আগে টাইফয়েড জ্বর হয়েছিল। ওষুধে-ডাক্তারে একেবারে জেরবার হয়ে গিয়েছি।

গৌর ভট্টাচার্যি মুখ ঘোরালেন। বললেন—তা জেরবার হলে আমি কী করবো? তোমার ফেল-করা ছেলেকে আমি পাশ করিয়ে দেবো? আমি ওসব পারবো না—আমি কে? ইস্কুলের হেডমাস্টার আছে, প্রেসিডেণ্ট আছে, সেক্রেটারি আছে, ম্যানেজিং কমিটি আছে, তারাই তো আসল। তাদের কাছে যাও—আমি কে?

কিন্তু ওসব কথা বললেই কি আর কেউ শোনে?

সেদিন সংস্কৃত ক্লাশ নিচ্ছেন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই। 'লতা' শব্দরূপ কেউ মুখস্থ বলতে পারে না। একে একে সকলকে

জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ক্লাশ সিক্সের ছেলে সব।

গৌর ভট্টাচার্যি জিজ্ঞেস করলেন—এই, তুই বল, তুই—

বেছে বেছে যারা ক্লাশের শেষ বেঞ্চিগুলোতে বসে, তাদেরই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—কী রে, ক্লাশ সিক্সের ছেলে তুই, 'লতা' শব্দরূপ মুখস্থ বলতে পারলিনে, তাহলে বড় হয়ে করবি কী? পরীক্ষায় পাশ করবি কী করে?

তারপর চললো বক্তৃতা। যে বক্তৃতা তিনি সারা জীবন প্রত্যেক ক্লাশের ছেলেদের দিয়ে এসেছেন।

হঠাৎ দরজার কাছে নজরে পড়লো কালীর মা'র নাতি মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে।

—কী রে, শ্রীমন্ত না? আয় ভেতরে আয়—আয়—

শ্রীমন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুতেই ভেতরে আসতে চায় না। অনেক বলাবলির পর গুটি গুটি পায়ে ভেতরে এল। এসেই কেঁদে ফেলেছে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ঝরঝর করে।

—কী রে, কী হয়েছে তোর? ক্লাশে ঢুকছিস না কেন?

শ্রীমন্ত কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার নাম কাটা গেছে স্যার—

—কেন? নাম কাটা গেছে কেন?

বলে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই শ্রীমন্তর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

—বল্, কী হয়েছিল? মাইনে দিতে পারেনি তোর বাবা?

শ্রীমন্ত চুপ করে রইল। গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—আমি যে তোর দিদিমার দরখাস্ত সেক্রেটারিকে দিয়েছি, তবু নাম কেটে দিলে?

হঠাৎ বাইরে ঢং ঢং করে জনার্দন ইস্কুলের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এ ক্লাশটা শেষ হয়ে গেল।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—চল, আমার সঙ্গে চল, আমি দেখছি—

শ্রীমন্তকে সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিত মশাই সোজা চলে গেলেন অফিস-ঘরে। হরলাল ইস্কুলের ক্লার্ক। হরলাল মাইনে-পত্র নেয়, হিসেব-পত্র রাখে। মোটা মোটা কাজগুলো সবই সে একলা করে। হরলাল তখন একমনে হিসেবের খাতা দেখছে। আর এক হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। পণ্ডিত মশাইকে দেখেই বিড়িটা ঝপ করে মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে পিষে ফেলেছে। হাতের হিসেবটা রেখে সোজা দাঁড়িয়ে উঠলো।

—হরলাল, এই শ্রীমন্তর নাম তুমি কেটে দিয়েছ?

হরলাল যেন থতমত খেয়ে গেল। একে তার বিড়ি খাওয়া পণ্ডিত মশাই দেখে ফেলেছেন, তার ওপর এই অভিযোগ। তাড়া-তাড়ি ক্লাশ সিক্সের অ্যাটেনডেন্স খাতাটা বর করে দেখাল।

বললে—আজ্ঞে, মাইনে যে ওর বাকি পড়েছিল ছ' মাস···

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—মাইনে বাকি পড়েছিল বলে একেবার এর নামটাই কেটে দিলে? একটা নোটিশ দিলে না কেন? নোটিশ না দিয়েই নাম কেটে দিতে হয়? এ তোমাদের কী রকম আক্কেল হরলাল? আমিও তো আগে ইস্কুল চালিয়েছি, তখন নোটিশ না দিয়ে কারো নাম কেটেছি? তুমি তো পুরোনো আমলের লোক, তুমি তো সব দেখে আসছো—

হরলাল বললে—আজ্ঞে আমি হেডমাস্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তিনি যে নাম কেটে দিতে বললেন—

—কে? ভব? ভব নাম কাটতে বলেছে? দাও তো, হাজরি খাতাটা আমাকে দাও তো—

বলে সোজা গিয়ে ঢুকলেন একেবারে ভবরঞ্জনের ঘরে। তখন সেক্রেটারি নরেন চক্রবর্তীও বসে ছিল।

—এই যে, তুমিও আছ নরেন, ভালোই হয়েছে।

বলে হাজরি-খাতাটা বার করে বললেন—এই দেখ, শ্রীমন্ত হাজরা, ক্লাশ সিক্সের ছেলে, এর নাম কাটা গেছে।

ভবরঞ্জন দেখলে। সেক্রেটারি নরেনও দেখলে।

ভবরঞ্জন বললে—আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, ছ'মাস মাইনে বাকি পড়েছিল ওর, তাই নাম কেটে দিতে বলেছিলুম—

সেক্রেটারির দিকে চেয়ে গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তা আমি যে তোমাকে শ্রীমন্তর একটা দরখাস্ত দিয়েছিলাম এক মাস আগে, সেটার কী করলে?

—আমাকে দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো করে মনে করে দেখ। শ্রীমন্তর ফ্রি-শিপের জন্যে। আমি নিজে হাতে করে তোমার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, ভালো করে মনে করে দেখ···

নরেন চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি নিজের পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলে কাগজপত্র হাতড়াতে লাগলো। এক পাহাড় কাগজ ভেতরে। কোর্টের নথিপত্র, ইস্কুলের কাগজ, আরো কত কী! শেষকালে বেরোল শ্রীমন্তর দরখাস্ত। সেখানা নিয়ে বললে—এই যে পেয়েছি—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তারিখ দেখ, কত তারিখে দরখাস্তখানা দেওয়া হয়েছে—

সত্যিই তারিখ মিলিয়ে দেখে বোঝা গেল প্রায় এক মাস আগে দরখাস্তখানা দেওয়া হয়েছে সেক্রেটারিকে।

—আর এদিকে তোমরা এর নাম কেটে দিয়ে বসে আছ! বেচারা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে আমার ক্লাশের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ে ঢুকতে পারছে না। এই রকম করে চালালে ইস্কুল কী করে চলবে? তার নাম কাটবার আগে একবার নোটিশ দিলে না কেন? এ তোমাদের কী রকম বিচার? আমিও তো আগে ইস্কুল চালিয়েছি, তখন নোটিশ না দিয়ে কারো নাম কেটেছি? তোমরা তো আমার পুরোনো ছাত্র, তোমরা তো সব দেখে আসছো···

ভবরঞ্জন গলাটা নামিয়ে বললে—তখন স্কুল ছোট ছিল, তখনকার কথা আলাদা পণ্ডিত মশাই, এখন ছেলে বেড়েছে, সকলেই ডিফলটার, ক'জনকে নোটিশ দেবো···

—তা ডিফলটার হয়েছে কি সাধ করে? বাপেদের অবস্থা

খারাপ হয়েছে বলেই সব ডিফলটার হয়েছে।

তারপরেই নরেনের দিকে চেয়ে বললেন—আর তোমাকেও বলি, এক মাস আগে ফ্রি-শিপের দরখাস্তখানা পেয়েছ, তুমি সেখানা চেপে রাখলে কী বলে ?

নরেন চক্রবর্তী বললে—ফ্রি-শিপের দরখাস্ত শ্রীমন্তর একলার নয় পণ্ডিত মশাই। আপনি কত ফ্রি-শিপের দরখাস্ত আমার হাতে দিয়েছেন বলুন তো ? এই দেখুন—

বলে এক বাণ্ডিল দরখাস্ত ব্যাগ থেকে বার করে দেখালে।

বললে—এতগুলো ছাত্রকে যদি ফ্রি-স্টুডেণ্টশিপ দেওয়া যায় তো ইস্কুল কী করে চলে বলুন তো ? ইস্কুলও তো চলা চাই, এত বড় ইস্কুলের পেছনেও তো খরচ আছে—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—ইস্কুলের খরচ আছে স্বীকার করি। এতগুলো শিক্ষককে মাসে মাসে মাইনে দিতে হয়, তার একটা খরচ নেই ? কিন্তু ইস্কুলের খরচ আছে বলে কি যাদের দেবার ক্ষমতা নেই, যারা ভালো ছাত্র, তাদের কাছ থেকে তোমরা জোর করে মাইনে নেবে ? ইস্কুল তো মুদিখানা নয়, ইট-চুন-সুরকির দোকানও নয়। ইস্কুলের কাজ তো বিদ্যা দান করা, যাতে মানুষ বিদ্বান হয়, শিক্ষিত হয়, সচ্চরিত্র হয়। আমি আমার আমলে গরীব মেধাবী ছাত্রদের ফ্রি করে দিইনি ? তোমরা তো সে-সব আমল দেখেছ। চাঁদার ঝুলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরিনি ? তারপর যখন টাকার অনটন হয়েছে তখন তোমার বাবার কাছে গিয়েছি, মথুর সা' মশাই-এর কাছে গিয়েছি। তাঁরা টাকা কর্জ দিয়েছেন, আবার সুদিন এলে তাঁদের টাকা পাই-পয়সাটা পর্যন্ত শোধ করেছি। ইস্কুলের টাকার কমতি থাকে তো তোমরাও এখন কর্জ দাও। নিমাই সা' রয়েছে, কমিটির মেম্বাররা রয়েছে, তারা টাকা দিক। তারা কী জন্যে রয়েছে ? তারা এখানে এসে শুধু মিটিং করে খেয়ে-দেয়ে গেলে তো চলবে না, তাদেরও দায়িত্ব আছে।

বলতে বলতে দম নিলেন একটু। তারপর বললেন—যাক গে,

তোমরা যা ভালো বোঝ করো। আমি এত কথা বলবার কে? আমি ফাউণ্ডারও নই, লাইফ-মেম্বারও নই এ-ইস্কুলের। এর সেক্রেটারি তুমি, প্রেসিডেন্ট নিমাই, এর ম্যানেজিং কমিটি আছে, যা-যা থাকা নিয়ম সবই আছে। তোমরা যা ভালো বুঝবে তাই-ই করবে, আমার বলা কর্তব্য তাই বললাম, এখন তোমাদের অভিরুচি—

বলে গৌর ভট্টাচার্যি আর দাঁড়ালেন না। ইতিমধ্যে তাঁর অন্য ক্লাশ নেবার আছে। তিনি হন হন করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ভবরঞ্জন বললে—দেখলেন তো, আজকাল মাস্টার মশাই-এর এই রকম হয়েছে—

নরেন চক্রবর্তী বললে—আরে, ওঁকে বলতে দাও। ওসব সেকেলে আউট-লুক নিয়ে কি আজকাল স্কুল চালানো যায়? সেকাল আর একাল?

ভবরঞ্জন বললে—তাহলে নেক্স্ট মিটিং কবে ডাকবো?

নরেন চক্রবর্তী বললে—সাত দিনের নোটিশ তো অন্তত দরকার, তুমি পনেরো তারিখে মিটিং ফেলো—

—কী এজেণ্ডা দেবো?

নরেন চক্রবর্তী বললে—ছাত্রদের টিউশন ফি বাড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা—

ভবরঞ্জন নোটবই বার করে তাতে পয়েণ্টটা লিখে নিলে।

ফটিককে নিয়েই মুশকিলটা হলো বেশি। যে-ক'জন ভোর বেলা গৌর ভট্টাচার্যির দাওয়ায় পড়তে বসে, তাদের দলে ফটিকও ঢুকে পড়েছিল।

রানী বলে—ওই দেখ দাদু, ফটিক পড়ছে না—

গৌর ভট্টাচার্যি চোখ ফিরিয়ে দেখেন ফটিক একটা বেড়ালকে কোলে নিয়ে আদর করছে। আর বেড়ালটাও বেশ আরামে কোলে শুয়ে শুয়ে আদর খাচ্ছে।

—এই, ফ্যাল ফ্যাল, ফেলে দে ওকে। বেড়াল কোত্থেকে নিয়ে এলি আবার? আর বেড়ালগুলোই বা এখানে কোত্থেকে জ্বালাতে আসে?

বেড়ালটাকে ফেলে দিতেই সুড়সুড় করে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গৌর ভট্টাচার্যি ফটিকের কান ধরে নেড়ে দিলেন—কেবল খেলা, কেবল খেলা, পড়ার দিকে কোনও মন নেই—এই করে তুমি মানুষ হবে? এমনি করে কেবল খেলা করলে একটি গাধা হবে, বাপের মতন পাঁঠা হবে—

রান্নাঘর থেকে শিবানী শুনতে পায় সব। যখন মারের মাত্রা বাড়ে তখন আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না শিবানী। একেবারে দাওয়ার সামনে বেরিয়ে আসে।

বলে—ওকি, ওকে অত মারধোর করছ কেন?

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—মারবো না? লেখাপড়া না করলে মারবো না? নাতি বলে কি ওকে খাতির করবো নাকি?

শিবানী বললে—তাই বলে ছেলের সামনে ছেলের বাপকে গালাগাল দেবে? গাধা বলবে? পাঁঠা বলবে?

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—তা তোমার জামাই কি মানুষ? মানুষ হলে তোমার সামনে সিগারেট বিড়ি খায়? মানুষ হলে তোমার মেয়েটাকে মেরে ফেলে? গাধা বলে কী অন্যায়টা করেছি আমি? আরো অনেক কিছু বলিনি তাই-ই যথেষ্ট···

শিবানী বলে—তা তুমিই তো বেছে বেছে অমন জামাই করেছিলে! তুমিই তো বলেছিলে তোমার নাম শুনে পাত্র আর মেয়ে দেখবে না। তখন ভালো করে খোঁজ-খবর নিলে না কেন? যে ইস্কুল চালাতে পারে, এতগুলো ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারে, সে সংসার করতে পারে না?

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—তা আমি কি সংসার করছি না? না তোমাকে আমি উপোস করিয়ে রেখেছি?

শিবানী বলে—উপোস করছি কি খেয়ে-পরে সুখে আছি, সে আমার ভগবানই জানে! আমার কথা আর না-ই বা তুললে? আমার সুখের কথা কোনও দিন তুমি ভেবেছ? আমি বাঁচলুম কি মরলুম তা তোমার দেখবার দরকার কী? তোমার ইস্কুল ভালোভাবে চললেই হলো!

রানী এবার আর থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি শিবানীর কাছে উঠে যায়। বলে—দিদিমা, তুমি এবার থামো তো! অনেক বকেছ দাছুকে, এবার একটু থামো দয়া করে—

রানীর কথায় যেন শিবানীর সংবিৎ ফিরে এল। আর সেখানে দাঁড়ালো না। একেবারে সোজা রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে নিজের হাতা-বেড়ি-খুন্তি নিয়ে পড়লো।

রানীও রান্নাঘরের সামনে গেল।

বললে—তুমি সব সময় কেন দাছুকে বকো বলো তো দিদিমা—

শিবানী বললে—তুই থাম তো, তুই আর জ্বালাসনে আমাকে—

রানী বললে—বা রে, বেশ তো আবদার, তুমি আমার দাছুকে বকবে আর আমি বুঝি চুপ করে থাকবো?

শিবানী বললে—তুই দেখতে পাস না তোর দাছু মা-মরা ছেলেটাকে কী-রকম করে বকে? ওই ছেলেমানুষ অত লেখাপড়া করতে পারে? খেলাধুলো কিছুছু করবে না, শুধু সারা দিন পড়বে? সবাই কি তোর দাছুর মত বুড়ো? ছেলেমানুষের একটা সাধ-আহ্লাদ থাকবে না?

রানী বললে—তা ফটিকও যে বড় বেয়াড়া দিদিমা—

শিবানী বললে—ছেলেমানুষরা একটু বেয়াড়াই হয়। তা বলে তাকে অত মারধোর করতে হবে? তোকে তো কই মারে না! এখানে ওর বাবা নেই বলে ও-রকম করে বকতে হবে? ও তো পরের ছেলে—

হঠাৎ দাদুর গলা শোনা গেল—রানী, ও রানী—

রানী দৌড়ে এল। বললে—কী দাদু ?

গৌর ভট্টাচার্যি রানীকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, দিদিমা কী বলছিল রে তোকে ? খুব রাগ করেছে বুঝি আমার ওপর ?

রানী বললে—তোমারই তো দোষ দাদু, তুমি কেন ফটিককে অমন করে মারো ? কই, আমাকে তো মারো না, আমিও তো দুষ্টুমি করি—

দাদু বললেন—তোমাকে কেন মারবো মা, তুমি দুষ্টুমি করলেই বা, তুমি যে মন দিয়ে লেখাপড়া করো। মন দিয়ে যে লেখাপড়া করে তাকে কি আমি কিছু বলি ? তুমি যে ইস্কুলে লেখাপড়ায় ফার্স্ট হও ! তুমি আমার কত লক্ষ্মীদিদি বলো তো ?

বলে পণ্ডিত মশাই রানীকে আদর করতে লাগলেন।

রানী বলে উঠলো—যাও, আর আমাকে আদর করতে হবে না, তোমার আবার ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে, তখন দিদিমা আমাকেই আবার বকবে—যাও—

গৌর ভট্টাচার্যি উঠে গেলেন।

রানীও উঠলো। বই খাতা শ্লেট নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি আসি দিদিমা—

তখন অন্য সবাই চলে গেছে। ফটিক শুধু একমনে বই মুখে দিয়ে বসে ছিল।

রান হঠাৎ তার দিকে এগিয়ে গেল। বললে—এই ওঠ, খুব পড়া হয়েছে, আর পড়তে হবে না। উঠে পড়, ভাত খেয়ে ইস্কুলে যা, বেলা হয়ে গেছে না !

বলে তার মাথায় আস্তে আস্তে মারতে লাগলো।

ফটিক রেগে গিয়ে বললে—তুমি আমায় মারছো কেন, বা রে—

রানী বললে—বেশ করবো মারবো, তোর জন্যে যে আমাকে বকুনি খেতে হয় রোজ। তুই লেখাপড়া করবি না, দুষ্টুমি করবি

কেবল, আর আমি মাঝখান থেকে বুঝি বকুনি খাবো, না?

ততক্ষণে দিদিমাও এসে গেছে। দিদিমাও বললে—এই ওঠ, উঠে চান করতে যা, আমি ভাত বাড়ছি, শেষকালে খাওয়া হবে না, একসঙ্গে তোর আর দাদুর ভাত বাড়ছি—

ফটিক বলে উঠলো—দেখছো তো দিদিমা, রানী আমায় মারলে।

দিদিমা বললে—বেশ করবে মারবে। পড়া নেই শোনা নেই, কেবল দুষ্টুমি। দুষ্টুমি করলে মারবে না? দিদির মত ইস্কুলে ফার্স্ট হতে পারিস তুই?

ফটিক উঠলো। বললে—সবাই মিলে আমায় কেবল মারো। এ-রকম করে মারলে কিন্তু একদিন আমি পালিয়ে যাবো ঠিক—তা বলে রাখছি—

দিদিমা বললে—পালিয়ে যাবি তো যা না, কোথায় পালিয়ে যাবি তুই শুনি? কোন চুলোয় যাবি?

ফটিক বললে—আমি বাবার কাছে চলে যাবো—

রানী বললে—ওমা, এইটুকু ছেলের কী বুদ্ধি দেখ দিদিমা। তা বাবার কাছে যে পালিয়ে যাবি, রাস্তা চিনতে পারবি?

দিদিমা বললে—যাক না বাবার কাছে, গিয়ে দেখুক না সেখানে কত আদর পায়। বাপ তো সেই এখেনে রেখে গেছে, একটা চিঠি লিখেও তো খবর নেয় না। বাপ যে ছেলের জন্যে কত ভাবছে তা খুব বোঝা গেছে—

—ও রানী, রানী!

হঠাৎ বাসন্তী এসে হাজির। এসে কাণ্ড দেখে অবাক।

বললে—কী রে রানী, এত দেরি কেন? ইস্কুল যাবিনে?

রানী বললে—এই দেখ না মা, ফটিক বলছে ও পালিয়ে যাবে—

—ওমা, সে কী কথা খুড়ীমা, পালিয়ে যাবে কেন? কোথায় পালিয়ে যাবে?

খুড়ীমা বললে—কোথায় পালিয়ে যাবে ও-ই জানে। বলে বাপের কাছে পালিয়ে যাবে। বাপের যে ছেলের জন্যে কত মায়া তা

খুব বোঝা গেছে। গিয়ে পর্যন্ত একটা চিঠি লিখে খবর নেয় না যে, ছেলে কেমন আছে। যেমন বাপের ছিরি।

বাসন্তী বললে—সে কী? গিয়ে পর্যন্ত একটা চিঠিও লেখেনি জামাই?

শিবানী বললে—মেয়ের জন্যেই সম্পর্কটা ছিল এতদিন, সেই মেয়েই যখন চলে গেছে তখন কার জন্যে সে সম্পর্ক রাখবে বৌমা? সম্পর্ক রাখতে বয়ে গেছে তার—

বাসন্তী বললে—যে গেছে সে গেছে, কিন্তু ছেলে তো তার নিজের—

শিবানী বললে—ওই যে তোমার খুড়োমশাই, সারাটা জীবন শুধু ইস্কুল আর ইস্কুল, বাড়িতে যে কী খাচ্ছি আমরা, বেঁচে আছি কি মরে গেছি, তা তো কখনও দেখলেন না। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, তাও একটা ভাল মত জায়গায় দিলেন না, কাকে কী বলবো বলো বৌমা, সবই আমার কপাল—

গৌর ভট্টাচার্যি তখন পুকুর থেকে চান করে এসেছেন, ফটিকও চান করতে গেছে। বাসন্তী বললে—আসি তাহলে খুড়ীমা, চল রানী চল—বেলা হয়ে গেল—

বলে মেয়েকে নিয়ে বাসন্তী চলে গেল।

বলরামপুর হাই স্কুলের আদিতে একটা বাড়িই ছিল। প্রথমে টিনের চালায় দু'খানা ঘর নিয়ে ছিল গৌর ভট্টাচার্যির পাঠশালা। ওই টিনের চালার তলায় বসে গরমে তালপাতার পাখার বাতাস করতে করতে ঘেমে নেয়ে উঠতেন। তখন লোকে বলতো গৌর মাস্টারের পাঠশালা। ওই টিনের চালায় বসে বসেই বিরাট একটা

প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। মনে মনে কল্পনা করতেন একদিন এই টিনের চালা পাকা বাড়ি হবে। ছাত্ররা সেই পাকাবাড়িতে এসে মানুষ হবে। তা তাও একদিন হলো। পাকা বাড়িই হলো। পাকা বাড়িতে এসেই ছেলেরা লেখাপড়া শিখতে লাগলো।

বিনোদ ওই সময়কারই ছাত্র।

বিনোদের মা ছিল বিধবা মানুষ। বিধবা হবার পর ওই ছেলেটিকে বুকে করেই একদিন গৌর ভট্টাচার্যির পায়ের কাছে রেখে বলেছিল—একে আপনার কাছেই দিয়ে গেলাম পণ্ডিত মশাই, আপনি ওকে দেখবেন, ও আপনারই ছেলে মনে করবেন—

এক ফালি সরু লিকলিকে চেহারা তখন বিনোদের। মুখখানা দেখে কেমন দয়া হলো গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর। বললেন—আমি কে বিনোদের মা? তাঁর ইচ্ছে থাকলেই তোমার বিনোদ মানুষ হবে। এই যে আমি ইস্কুল করেছি, এ কি আমার বাহাদুরি মনে করো? তাঁর যদি ইচ্ছে হয় তো ইস্কুল চলবে, বড় হবে; তেমনি তাঁর যদি ইচ্ছে হয় তো তোমার ছেলেও মানুষ হবে। তাঁর ওপর সব কর্ম সমর্পণ করে দাও, দেখবে যাঁর কর্ম তিনিই করবেন, তুমি আমি সবাই নিমিত্তমাত্র—

তারপর সেই বিনোদই এই স্কুল থেকে পাশ করলে, বৃত্তি নিয়ে সদরে পড়তে গেল। সেখানেও বৃত্তি পেলে। সেখান থেকে গেল কলকাতায়। সেখান থেকে বি-এ পাশ করলে। তারপর···

একদিন গৌর ভট্টাচার্যি দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি এলেন।

—শুনছো বড়বৌ, বিনোদ আমাদের কলকাতায় বি-এতে ফার্স্ট হয়েছে।

শিবানীও খবরটা শুনে খুশী হলো। বললে—আহা, ওর মা বেঁচে থাকলে কত আনন্দ করতো—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর হাতে তখনও বিনোদের চিঠি। বললেন—এই দেখ, খবরটা পেয়েই আমাকে চিঠি লিখেছে। লিখেছে—আপনার আশীর্বাদেই আমি এই সাফল্য অর্জন করিতে

পারিয়াছি। আগামী সপ্তাহেই বলরামপুর যাইয়া আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া আসিব। আমি আই-এ-এস পরীক্ষা দিব বলিয়া প্রস্তুত হইতেছি। ইতি প্রণতঃ আপনার বিনোদ—

শিবানীকে শুনিয়েও যেন তৃপ্তি হলো না গৌর ভট্টাচার্যির। চিঠিখানা নিয়েই আবার বেরোলেন।

শিবানী বললে—এখন আবার কোথায় যাচ্ছ ?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তুমি তো কেবল বলতে আমি ইস্কুল ইস্কুল করে পাগল। এখন বোঝ আমি কেন ইস্কুল ইস্কুল করে পাগল হয়েছিলাম। এখন যাই চিঠিটা একবার নরেনকে পড়িয়ে আসি—

— ! এই অবেলায় আবার বেরোবে ? খেয়ে-দেয়ে বিকেল বেলা বেরোলে হতো না ?

কিন্তু ততক্ষণে একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন গৌর ভট্টাচার্যি শাই। সেই বাইরের রাস্তা থেকেই চেঁচিয়ে বললেন—না না, এখন খাওয়া থাক, বরং তুমি খেয়ে নি । আমার দেরি হবে, আগে খবরটা সকলকে বলে আসি—

সেদিন যখন বাড়ি ফিরলেন গৌর ভট্টাচার্য মশাই তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ততক্ষণে বলরামপুরের কারও আর জানতে বাকি থাকলো না যে, গৌর মাস্টারের ইস্কুলের বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার কলেজে বি-এতে ফার্স্ট হয়েছে, স্কলারশিপ পেয়েছে আর ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

নরেন চক্রবর্তী মশাই তখন কোর্টে। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লেন। নরেন না-ই বা থাকলো, বৌমা তো আছে।

—বৌমা, ও বৌমা, বৌমা কোথায় গো ?

বাসন্তী তখন খাওয়া-দাওয়া করে সবে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল। সামনে এসে বললে—কী খুড়োমশাই ?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই পকেট থেকে বের করে চিঠিটা বার করে

দেখালেন—এই দেখ বৌমা, এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, আমার বিনোদ লিখেছে—

বলে নিজেই পড়তে লাগলেন—শ্রীচরণেষু, আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায়···

বলে সমস্ত চিঠিটার শেষ লাইন পর্যন্ত পড়ে শোনালেন। বললেন—দেখেছ তো বৌমা, তোমার খুড়ীমা তো কেবল বলেন আমি ইস্কুল-ইস্কুল করেই পাগল। এখন বোঝ, কেন আমি ইস্কুল-ইস্কুল করে পাগল হয়েছিলাম। নরেন কোর্ট থেকে এলে তাকে খবরটা দিও, বুঝলে? সে শুনলে খুশী হবে। আমি ভবরঞ্জনকে চিঠিটা পড়িয়ে এসেছি। তোমার খুড়ীমাকে পড়িয়ে এলাম, এখন তোমাকে পড়ালুম, এবার যাবো পুব পাড়ার গঞ্জের দিকে, নিমাইকেও একবার পড়িয়ে আসি, তারপরে···

তারপরে যেন হঠাৎ মনে পড়লো। বললেন—রানী কোথায়?

বৌমা বললে—ইস্কুলে গেছে—

—তাহলে রানীকেও বলে দিও বৌমা, আমার বিনোদ ফার্স্ট হয়েছে—

তখন আর দাঁড়াবার সময় নেই। সেখান থেকেই সোজা 'বলরামপুর ভ্যারাইটি স্টোর্সে' নিমাই সা'র কাছে। নিমাই সা' তখন স্কুল-কমিটির প্রেসিডেন্ট। সারাদিন কারবার নিয়ে মহা ব্যস্ত থাকে। তার অনেক রকমের কারবার। তবু তারই ফাঁকে ইস্কুলের কাজকর্ম দেখে।

—ও নিমাই, নিমাই আছ নাকি?

নিমাই সা' তখন ভেতরের ঘরে হিসেবপত্রের পাহাড় নিয়ে বসেছিল। মাস্টার মশাই-এর গলা শুনেই উঠে এল। বললে—আসুন মাস্টার মশাই, আসুন। কী খবর?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না, আমি এখন বসবো না, খবর শুনেছ? আমার ছাত্র বিনোদ, বিনোদকে তো তুমি চেন, সে বি-এতে ফার্স্ট হয়েছে। এই দেখ আমাকে চিঠি লিখেছে—

বলে পকেট থেকে চিঠিটা বার করে আবার পড়লেন। বললেন—দেখ, এ আমাদের ইস্কুলের গর্ব, তোমাদের সকলের গর্ব, বলরামপুরেরও গর্ব—

নিমাই সা' বললে—তাহলে আমাদের ইস্কুল ছুটি দিয়ে দেবেন? বিজয়ের সম্মানে একটা দিন না-হয় ছুটি দিলে হয়—?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না না, তা ঠিক হবে না নিমাই। ছুটি দিলে একটা দিনই লোকসান, লেখাপড়া কামাই করে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং তোমরা একটা সারকুলার দিয়ে সকলকে খবরটা জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো, তাতে ছেলেরা উৎসাহ পাবে—

বলে চলে যাচ্ছিলেন। নিমাই সা' পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল।

বললে—একটা কথা মাস্টার মশাই—

গৌর ভট্টাচার্যি পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন—কী?

—টীচাররা একটা জয়েণ্ট দরখাস্ত করেছে।

—কীসের দরখাস্ত?

—বলছে ওদের মাইনে না-বাড়ালে আর চলবে না। জিনিস-পত্তোরের দাম বাড়ছে—

গৌর ভট্টাচার্যি থমকে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন—কেন? মাইনে বাড়াতে চায় কেন? আমিও তো টীচার। আমায় তো কই কিছু বলেনি ওরা? আমি যদি কষ্টেস্বষ্টে চালিয়ে নিতে পারি তো ওরাই বা চালাতে পারবে না কেন? ওরা তো আবার নোট-বই লেখে, প্রাইভেট টিউশানি করে, কোচিং ইস্কুল করেছে। ওদের কীসের অভাব? না না, মাইনে বাড়াবার দরকার নেই। আর তোমরাই বা মাইনে বাড়াবে কী করে? তোমাদের ফাণ্ডে টাকা আছে?

নিমাই সা' বললে—সেই কথাই আমাদের কমিটির মিটিং-এ হচ্ছিল সেদিন। সবাই বললে ছাত্রদের মাইনেটা এক টাকা—আট আনা করে বাড়িয়ে যদি তার থেকে…

—না না না, অমন কাজ কোর না নিমাই। ছাত্রদের বাপ-মায়েদের অবস্থা তো তুমি জানো না। আমি সবাইকে চিনি। কারোর দেবার অবস্থা নেই, নইলে রোজ আমার বাড়িতে এসে তারা ধর্না দেয়? সবাই চায় তার ছেলেকে ফ্রি করে দিতে—না না, তোমারা রাজী হয়ো না—খবরদার, খবরদার অমন কাজটি কোর না—

বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। আর তখন তাঁর মাথায় ঘুরছে। তোমাদের কথা। আরও কাকে কাকে চিঠিটা পড়াবেন সেই কথাই তখন তাঁর মাথায় ঘুরছে। বললেন—আমি এখন চলি নিমাই, আমার এখন অনেক জায়গায় যেতে হবে—

গোড়ার দিকে প্রত্যেক কাজেই গৌর ভট্টাচার্যিকে জিজ্ঞেস করে কাজকর্ম চলতো। তখন কমিটির মেম্বার ছিলেন গৌর ভট্টাচার্যি। টীচারদের প্রতিনিধি। গৌর ভট্টাচার্যি যেমন বলতেন, তেমনি হতো।

কিন্তু খিটিমিটি বাধতে লাগলো পরে।

হঠাৎ হয়তো সন্ধ্যের আগেই বাড়িতে এসে হাজির হলেন পণ্ডিত মশাই। এমন সকাল-সকাল কখনও বাড়িতে আসতেন না। শিবানী অবাক।

বললে—কী গো, আজকে যে এত সকাল সকাল? আজকে তোমাদের কমিটির মিটিং নেই?

রানী বসে ছিল পাশে। সে বললে—বাঃ, তুমি শোননি বুঝি দিদিমা, দাদু তো কমিটি ছেড়ে দিয়েছে।

দিদিমা রানীর কথায় অবাক। বললে—ওমা, তুই কী করে জানলি?

রানী বললে, বাবা যে সেদিন মাকে বলছিল, আমি শুনেছি—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না গো, তা নয়, আমি আর কতদিন খেটে মরবো, ওরা এখন ছেলে-ছোকরা মানুষ, ওরা সব এখন থেকে কাজকর্ম শিখুক। আমি তো আর ইস্কুল চালাবার জন্যে চিরকাল থাকবো না। তখন ওরা কী করে কাজ চালাবে?

তারপর রানীর দিকে চেয়ে বললেন—ও যে এখন এখানে?

শিবানী বললে—জানো, ও ক্লাশের মধ্যে আবার ফার্স্ট হয়েছে—তাই আমাকে বলতে এসেছে—

—তাই নাকি? পণ্ডিত মশাই জামা খুলতে খুলতে থেমে গেলেন।

রানী বললে—হ্যাঁ দাদু, আমি সংস্কৃততে নব্বুই পেয়েছি—

—বাঃ, এ মেয়ে আমার নাম রাখবে ঠিক। তা তোর বাবা কী বললে। বাবা শুনেছে?

—বাবা এখনও বাড়ি আসেনি। আমি ইস্কুল থেকে ফিরেই তোমাকে বলতে এসেছি। আমায় তুমি কী দেবে বলেছিলে, দাও?

পণ্ডিত মশাই হাসতে লাগলেন—তাই তো, ওকে একটা কিছু দিতে হয় তো? তা তুই কী নিবি বল?

—আমি শাড়ি নেব।

—শাড়ি?

রানী বললে—হ্যাঁ শাড়ি, আমাকে মা মোটে শাড়ি পরতে দেয় না। বলে আমি নাকি এখনও বড় হইনি। আচ্ছা দিদিমা, ভাত রাঁধতে পারি না আমি? তোমার যখন অসুখ করেছিল তখন আমি ভাত রাঁধিনি?

দিদিমা তখন হাসছে।

পণ্ডিত মশাই-এর দিকে চেয়ে বললে—তা ওকে একটা শাড়ি কিনে দাও না। সত্যিই তো, ওরও তো দিদির মত শাড়ি পরতে ইচ্ছে করে—

পণ্ডিত মশাই-এর মেয়ে অবন্তী যখন একবার বলরামপুরে এসেছিল তখন রানী কেবল বায়না ধরতো শাড়ি পরবে বলে। দিদির মত শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দেবে। তখন আরও ছোট ছিল রানী।

বাড়িতে গিয়ে মা'র কাছে বায়না ধরেছিল—মা, আমি শাড়ি পরবো দিদির মতন—

বাসন্তী রাগ করেছিল—শাড়ি পরবি কেন? তুই কি দিদির মত বড় যে শাড়ি পরবি? না না, এখন শাড়ি পরতে দেবো না—

কিছুতেই সেবার শাড়ি কিনে দেয়নি মা। কিন্তু পণ্ডিত মশাই যখন শুনলেন সে সংস্কৃততে নব্বুই নম্বর পেয়েছে, তখন বললেন—ঠিক আছে, বৌমা সেবার শাড়ি দেয়নি, আমি তোকে এবার শাড়ি কিনে দেবো—

একেবারে সোজা বাজারে নিয়ে গেলেন সেবার রানীকে। নিমাই সা'র শাড়ির বিভাগও আছে।

গিয়ে বললেন—দাও তো নিমাই, ভালো দেখে নাতনীকে একটা শাড়ি দাও তো। নাতনীর বড্ড শাড়ি পরবার সখ।

নিমাই সা' দেখলে। বললে—এ কি, এ যে নরেনের মেয়ে দেখছি।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—নরেনের মেয়ে হলে কি হবে, ও আমারও তো নাতনী। বাপের কাছে তো আদর পায় না, ওর মা'র কাছেও আবদার খাটে না, যত আবদার আমার কাছে। সংস্কৃততে এবার এ নব্বুই পেয়েছে। তাই একটা শাড়ি দিতে হবে—

শাড়ি একটা পছন্দ হলো রানীর।

বাড়িতে রানীর খোঁজ পড়ে গেছে তখন। রানী কোথায়? ইস্কুল থেকে এসে কোথায় গেল?

পাঁচুর মাকে বাসন্তী বললে—হ্যাঁ গো পাঁচুর মা, রানী কোথায় জানো?

পাঁচুর মা এ বা ড়তে কাজ করে করে বুড়ি হয়ে গেছে। রানীকে মানুষ করেছে জন্মের সময় থেকে।

বাসন্তী বললে—বোধহয় খুড়ীমার বাড়িতে গেছে, কিছু খেলে না দেলে না, ডেকে নিয়ে এসো তো পাঁচুর মা—

পাঁচুর মা খেয়ে-দেয়ে একটু ঝিমোচ্ছিল মেঝের ওপর। বললে—তোমার ও মেয়েকে কে ডাকতে যাবে মা? কার এত বুকের পাটা?

—কেন, তুমি কান ধরে টানতে টানতে আমার কাছে নিয়ে আসবে। কেবল টো-টো করে বেড়ানো, আমি আজ দেখে নেব—

পাঁচুর মা তবু নড়লো না। আগের দিন পাঁচুর মাকে হাতে এমন আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে যে, সেই ঘা-ই এখনও শুকোয়নি।

শেষকালে বাসন্তী নিজেই গেল। টা-টা করছে দুপুর। তবু পুকুরের পাড় ধরে পাকুড় গাছটার তলা দিয়ে একেবারে খুড়ীমার কাছে গিয়ে হাজির হলো বাসন্তী।

—খুড়ীমা!

—বৌমা, এসো এসো। রানীকে খুঁজতে এসেছো?

বাসন্তী বললে—আমি ঠিক ধরেছি রানী এখেনে। ইস্কুল থেকে এসে বাড়িতে আর এক তিল দাঁড়ায়নি। আমি কোথায় ওকে খেতে দেবো বলে ভাবছি আর কোন্ ফাঁকে এখেনে চলে এসেছে?

শিবানী হাসতে লাগলো। বললে—তা তুমি আবার কষ্ট করে এই দুপুরে এলে কেন? পাঁচুর মাকেই পাঠিয়ে দিলে পারতে! তা আমি তো ওকে জিজ্ঞেস করলুম, তুই মাকে বলে এসেছিস তো! তা ও বললে—মা জানে।

—দেখেছ খুড়ীমা, কী মিথ্যেবাদী হয়েছে আজকাল। তুমিই ওকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটা খাবে খুড়ীমা। ও আমাদের কথা আর মোটে শোনে না। তা কই সে? কোথায়?

—দেখবে তাকে? ওই দেখ।

বলে ঘরের ভেতরে তক্তপোষটার ওপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। বললে—দেখ—

বাসন্তী বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে চেয়ে দেখলে, রানী একটা ভুরে

শাড়ি পরে খুড়োমশাই-এর শোবার তক্তপোষের ওপর পাশ ফিরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

—ওমা, শাড়ি পেলে আবার কোত্থেকে? শাড়ি কে দিলে?

শিবানী হাসতে হাসতে বললে—তুমি যেন আবার ওকে বোক না বৌমা, খুব শাড়ি পরবার শখ ওর—

বাসন্তী বললে—শাড়ি পরবার জন্যে বুঝি বায়না করছিল তোমার কাছে?

শিবানী বললে—না না, তোমার মেয়ের স্বভাব অত খারাপ নয়, আমিই তোমার খুড়োমশাইকে বললাম শাড়ি দিতে। সংস্কৃততে নাকি নব্বুই পেয়েছে। তোমার খুড়োমশাই তো বলেছিলেন ফার্স্টো হলে একটা কিছু দেবেন। তা শাড়ি-শাড়ি করছিল, উনি শাড়ি কিনে দিলেন বাজারে নিয়ে গিয়ে—

বাসন্তী বললে—সত্যি খুড়ীমা, তোমরা এই আদর দিয়ে দিয়েই ওর মাথাটা খাবে। আমার কাছে বায়না করে করে পায়নি তাই তোমাদের ধরেছে—

শিবানী বললে—থাক থাক, ওকে আর কিছু বোল না। এখন ঘুমোচ্ছে ঘুমুক, পরে উনি ইস্কুল থেকে এসে তোমাদের বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবেন, তুমি যাও—

—কিন্তু ও কিছু খায়নি যে।

—খাওয়াতে কি আর বাকি রেখেছি আমি বৌমা? ও আমার কাছে চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। তোমার পেটেই শুধু জন্মেছে, কিন্তু বলতে গেলে ও আমারই মেয়ে, তুমি ওর জন্যে কিচ্ছু ভেবো না—

কন্তু ফটিক আসবার পর থেকেই এ-বাড়ির চেহারা বদলে গেল।

সেক্রেটারি নরেন চক্রবর্তীর ছেলে আসতে লাগলো ফটিককে ডাকতে। একই ক্লাশে পড়ে। একই সঙ্গে আড্ডা দেয়।

ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলেই শিবানী ভাবতে আরম্ভ করে। শম্ভুর মা গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর বাড়িতে কাজকর্ম করে। উঠোন ঝাঁট দিয়ে যায়, পুকুরে এঁটো বাসন নিয়ে গিয়ে মাজে। উনুনে আগুন দেয়। তারপর কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে আবার বাড়ি চলে যায়।

বিকেল বেলা কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়েই শিবানী উঠলো। দরজা খুলে দিতে দিতে বললে—হ্যাঁরে ফটিক, এতক্ষণ কোথায় ছিলি বাবা ?

কিন্তু না, ফটিক নয়, শম্ভুর মা।

—ওমা তুমি ? আমি ভাবি আমার নাতি এসেছে বুঝি ? কখন ইস্কুল ছুটি হয়ে গেছে, এখনও এলো না, বড় ভাবছি—

শম্ভুর মা বললে—তোমার ফটিকের কথা বলছো ? ও তো গঞ্জের ধারে নদীতে নৌকো চালাচ্ছে—

—নৌকো চালাচ্ছে ? কাদের নৌকো ?

শম্ভুর মা বললে—কে জানে মা কাদের নৌকো।

শিবানী তো অবাক।

বললে—নৌকো চালাতে জানে নাকি ফটিক ?

শম্ভুর মা বললে—তা জানিনে মা, দেখলাম সঙ্গে রয়েছে নরেনবাবুর ছেলে—

শিবানী বললে—দেখ দিকিনি কাণ্ড, আমি এদিকে ভেবে মরছি, আর সে গঞ্জে গেছে আড্ডা দিতে—

শিবানী বড় ভাবনায় পড়লো। বললে—একবার যাবি মা, ফটিককে ডেকে আনবি! বলবি যে, তোমার কী রকম আক্কেল খোকাবাবু, তোমার দিদিমা এদিকে বাড়িতে বসে বসে ভাবছে আর তুমি এখেনে খেলা করছো ? বলবি দাদুকে বলে দেবো—

শম্ভুর মা'র যাবার ইচ্ছে ছিল না। তবু যেতে হলো। বললে—

তোমার নাতি বাপু দিন দিন বড় বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। তোমরা কিছু বলো না ওকে—

বিধু কয়াল আড়তের কাজ করছিল ঘাটের ধারে বসে।

শম্ভুর মা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো, এখানে পণ্ডিত মশাই-এর নাতিকে দেখেছিলুম নৌকোর ওপর খেলা করছে, কোথায় গেল গো সে?

বিধু নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। সে শুনে অবাক। বললে—আমি জানিনে—

শম্ভুর মা এদিক-ওদিক একবার দেখলে। তারপর বাড়িতে চলে এল।

বললে—না মা, পেলাম না।

শিবানী বললে—পেলে না কী গো? তাহলে গেল কোথায়?

শম্ভুর মা'রও কাজ-কর্ম আছে। বাসন মাজতে হবে তাকে পুকুর ঘাটে গিয়ে। রান্নাঘর ধুয়ে মুছে গোবর নিকিয়ে দিতে হবে। কাজের কি কিছু কামাই আছে গেরস্থর বাড়িতে। গতরে খেটে খেতে হয় তাকে, তবে মাস গেলে মাইনে আসে হাতে। বাসনের গোছা নিয়ে সে পুকুরঘাটের দিকে চলে গেল। আর দাঁড়ালো না।

শিবানী আর কী করবে? বাড়ির গিন্নী আর কীই বা করতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তো আর নাতিকে খুঁজতে পারে না। চুপ করে হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই!

শম্ভুর মা বাসন নিয়ে আসতেই শিবানী বললে—হ্যাঁ গো, একটু ভালো করে খুঁজলে না কেন একবার? দেখ দিকিনি, সেই কখন ইস্কুলে গেছে, এত বেলা পর্যন্ত খাওয়া নেই দাওয়া নেই, কোথায় ঘুরছে? তা হ্যাঁ গো, আর একটু খুঁজে দেখলে পারতে—

শম্ভুর মা বললে—ছেলেমানুষ, একটু ঘুরে বেড়াবে না? আসবে, ঠিক আসবে, অত ভেবো না তুমি।

শিবানী বললে—না ভেবে কি থাকতে পারি রে?

শম্ভুর মা আর কিছু বললে না। চুপ করে রইল।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা দরজার কড়া নড়ে উঠতেই শিবানী উঠে দরজা খুলে দিয়েছে। যাক, তবু এল। দরজা খুলতে খুলতেই বললে—হ্যাঁ রে ফটিক, এত দেরি করে আসতে হয় বাবা···

কিন্তু না। এ অন্য লোক। একেবারে অচেনা মুখ।

—পণ্ডিত মশাই আছেন?

শিবানী বললে—কে তুমি? পণ্ডিত মশাই ইস্কুলে—

লোকটা বললে—দেখুন, মা-জননী, আমি এসেছি বীরগঞ্জ থেকে—

—বীরগঞ্জ? সে তো অনেক দূর?

—হ্যাঁ মা-জননী, আমি অনেক দূর থেকেই আসছি! আপনার নাতি ফটিক, সে আমাদের দোকানের খাবার খেয়েছে, পয়সা দিচ্ছে না।

শিবানী বললে—ফটিক? সে কোথায়?

লোকটা বললে—সে পালিয়েছে—

শিবানী অবাক হয়ে গেল। বললে—খেয়ে পয়সা না দিয়ে পালিয়েছে? কী খেয়েছে?

লোকটা বললে—চপ্ কাটলেট ডিমের কারি। যা চেয়েছে খেতে, আমরাও তাই দিয়েছি। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে তখন বলছে পয়সা নেই। সঙ্গে নরেনবাবুর ছেলে সুশীলও ছিল, কারো কাছেই পয়সা ছিল না।

শিবানী কী করবে বুঝতে পারলে না।

হঠাৎ রানী এসে ঢুকলো।

—কী হয়েছে দিদিমা? এ কে?

শিবানী যা শুনেছিল সব খুলে বললে। রানী লোকটাকে জিজ্ঞেস করলে—কত টাকার খেয়েছে গো?

লোকটা বললে—তা দু'জনে মিলে তিন টাকা সাত আনা—

রানী বললে—তা তুমি তো দেখলে তারা ছেলেমানুষ, তাদের পকেটে টাকা আছে কিনা না-দেখে কেন খেতে দিলে? তোমাদেরই তো অন্যায়—

লোকটা বললে—দেখুন দিদি, একজন পণ্ডিত মশাই-এর নাতি, আর একজন নরেনবাবুর ছেলে, তাঁরা বলরামপুরের গণ্যমান্য লোক, এ জেনেও কী করে খেতে না দিই বলুন?

রানী বললে—তা তাদের ধরে পুলিশে দিতে পারলে না তোমরা?

লোকটা বললে—কী যে বলেন, ভদ্রলোকদের কি পুলিশে দিতে পারি?

শিবানী বললে—ওরে রানী, কেন অত কথা বলছিস মা, আর কথা বলতে হবে না, আমি টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি, শেষকালে লোক-জানাজানি হলে মুশকিল হবে—

রানী বললে—লোক-জানাজানি হলে কীসের মুশকিল হবে? যারা ঠকিয়েছে তাদের ওরা জেলে দিলে না কেন?

শিবানী বললে—ওরে, তোর দাদু শুনলে কী বলবে বল্ দিকিনি?

রানী বললে—কী আবার বলবে, মেরে ফটিকের শিরদাঁড়া ভেঙে দেবে। আসুক না সুশীল একবার বাড়িতে, আমি বাবাকে বলে দিয়ে তার পিঠে বেত ভাঙাবো—

তারপর লোকটার দিকে চেয়ে বললে—তুমি এসো তো আমার সঙ্গে, এসো, আমি তোমার টাকা দিয়ে দিচ্ছি—

বলে রানী নিজের বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। লোকটাও চলতে লাগলো রানীর পেছনে-পেছনে।

শিবানী বলে—ওরে শোন্ শোন্ রানী, আমি টাকা দিচ্ছি, নিয়ে যা—

রানী চেঁচিয়ে বললে—না দিদিমা, তুমি কিছু ভেবো না, আমার নিজের টাকা আছে, আমি নিজের টাকা থেকে দিয়ে দেবো—

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে গিয়ে নিজের চুল-বাঁধার বাক্স বার করলে। তার ভেতরে আর একটা ছোট টিনের বাক্স ছিল। সেটা খুলে তা থেকে গুনে গুনে তিনটে টাকা আর খুচরো সাত আনা বার করলে। তারপর বাক্সটা আবার ভেতরে রেখে দিলে।

বাসন্তী দেখতে পেয়েছে। বললে—কী রে, কী করছিস ওখানে?

রানী বললে—না মা, কিছু না—

—তবে চুল-বাঁধার বাক্স নিয়ে কী করছিস ?

রানী বললে—দিদিমার কাছে চুল বাঁধতে গিয়েছিলুম, রেখে দিচ্ছি—

বলে আস্তে আস্তে আবার পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে এল।

লোকটা ঝাপসা অন্ধকারে অশত্থ গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। রানী গিয়ে বললে—এই নাও তোমার টাকা। বেশ করে গুনে দেখে নাও। ঠিক হয়েছে তো ?

লোকটা ভালো করে গুনে নিয়ে টাকা-পয়সা পকেটে রাখলো।

রানী বললে—খবরদার বলছি, আর কখ্খনো ওদের দোকানে ঢুকতে দেবে না। যদি কখনো ঢুকে খেতে দাও, আমি আর টাকা দেবো না। এই বলে রাখলুম, হ্যাঁ যাও—

লোকটা মাথা নেড়ে চলে গেল। বীরগঞ্জ থেকে লোকটা এসেছে। আবার হেঁটে হেঁটে সেই বীরগঞ্জে যেতে হবে। পুকুরটা পেরিয়ে ওদিকে রাস্তাটা সরু হয়ে গেছে। দু'পাশে রাঙতার বেড়া-ঘেরা বাস্তুভিটের বাগান। একটা বিরাট নিমগাছ।

সেই নিমগাছের তলায় আসতেই ফটিক ধরলে।

—কী গো দোকানী, টাকা পেয়েছ ?

লোকটা বললে—হ্যাঁ, পুরোপুরি মিটে গেছে—

সুশীলও পাশে দাঁড়িয়েছিল। ফটিক বললে—তবে ? তবে যে খুব তম্বি করছিলে ? আমি বলিনি যে টাকা তুমি পেয়ে যাবে ?

সুশীল বললে—কোন্ বাড়িতে গিয়েছিলে ?

লোকটা বললে—পণ্ডিত মশাই-এর বাড়িতে—

ফটিক জিজ্ঞেস করলে—পণ্ডিত মশাই ছিল ?

লোকটা বললে—না—

লোকটা সুশীলের দিকে চেয়ে বললে—তোমার দিদি—তোমার দিদি বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার টাকা মিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আর যদি কখ্খনো দোকানে আসো তো মজা টের পাইয়ে দেবো—হ্যাঁ, তখন দেখবে—

ফটিক বললে—যাও, তোমার মত অনেক দোকানদার দেখেছি। বেশ করবো যাবো, কী করবে দেখবো—

লোকটা বললে—ঠিক আছে, একবার বীরগঞ্জে এসে দেখো—

ফটিক বললে—বীরগঞ্জ কি তোমার বাবার জায়গা? আলবত যাবো। বেশি লম্বা-লম্বা কথা বলো না—

লোকটা রুখে দাঁড়ালো। বললে—কী, করবে কি শুনি?

ফটিক বললে—কি করবো শুনবে? বেশি তম্বি করলে তোমার দোকানে আগুন ধরিয়ে দেবো, তখন টের পাবে মজা—

লোকটা এবার আর থাকতে পারলে না। এবার সামনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে—তবে রে ছোঁড়া, তোদের মজা টের পাওয়ানো দেখাচ্ছি—

বলে এগিয়ে আসতেই ফটিক আর সুশীল এক দৌড় দিয়েছে। ফটিক দৌড়তে দৌড়তে দূর থেকে বলতে লাগলো—তোর দোকানে বোমা ফেলবো, সোডার বোতল ছুঁড়বো—আমাকে চেনো না তুমি, বলরামপুরে এসে নবাবী করা হচ্ছে—

বলতে বলতে দু'জনে পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা খানিকক্ষণ হাবার মতন দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর যখন দেখলে কেউ কোথাও নেই, তখন আবার বীরগঞ্জের পথ ধরলে।

এ-সব ঘটনা পণ্ডিত মশাই-এর কানে উঠতো না।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই ক্লাশে পড়ানোর পরই বাড়িতে চলে আসতে পারতেন না। যে-সব ছেলেদের বাড়িতে হোম্‌-টাস্ক করতে দেন সেই খাতাগুলো তারা প্রতিদিন ক্লাশে নিয়ে আসে।

সেগুলো বাণ্ডিল বেঁধে নিজের ঘরটাতে নিয়ে আসেন তখন। সমস্ত ক্লাশের ছেলেদের একগাদা খাতা। ক্লাশ ওয়ান-টু থেকে শুরু করে ক্লাশ ইলেভেন পর্যন্ত। বাণ্ডিলগুলো খুলে সকলের খাতার পাতায় নম্বর দিতে শুরু করতেন।

আগে যখন স্কুল ছোট ছিল, তখন তিনিই ছিলেন হেডমাস্টার। তারপর একদিন হাই স্কুল হয়েছে। আগেকার নাম বদলে এখন সব হয়েছে ক্লাশ ওয়ান, ক্লাশ টু, ক্লাশ থ্রি, এই রকম। তারপর সেই হাই স্কুল এখন হয়েছে হায়ার সেকেণ্ডারি। আগে সংস্কৃত ছিল কম্পালসারি, সেই সংস্কৃত এখন হয়ে গেছে ঐচ্ছিক। এ্যাডিশনাল। এখন বড় স্কুল কমিটি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি কত কী হয়েছে।

কিন্তু এখন হেডমাস্টার না থাকলেও হেডমাস্টারের অনেক কাজই করতে হচ্ছে গৌর ভট্টাচার্যি মশাইকে। কোথায় খাবার জল আছে কিনা, ছেলেরা, টীচাররা ঠিক সময়ে আসে কিনা, এ-সব কাজও আসলে হেডমাস্টারের। কিন্তু গৌর ভট্টাচার্যি নিজে না দেখে কারোর ওপর ভার দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না।

জনার্দন এসে দাঁড়ায় সামনে।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর সেদিকে চোখ পড়তেই বলেন—কী জনার্দন, কিছু বলবে?

জনার্দনও পণ্ডিত মশাই-এর মতন বুড়ো হয়ে গেছে। স্কুলেই বাগানের কোনের একখানা চালা-ঘরে থাকে। সেখানেই রান্না করে। সেখানেই শোয়। আবার ডিউটির সময় সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই ডিউটি করে।

—কিছু বলবে জনার্দন?

—অনেক রাত হয়ে গেল, আপনি বাড়ি যাবেন না?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—আরে, দাঁড়া রে বাপু, আগে তো কাজ! কাজ শেষ করে তবে তো বাড়ি।

মাঝে মাঝে জনার্দনের সঙ্গে অনেক প্রাণের কথাও হয় গৌর

ভট্টাচার্যির। সারাদিনের পর রাত্তিরে ভট্টাচার্যি মশাই এক মনে নিজের কাজ করে চলেন আর জনার্দন সামনের মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে কথা বলে।

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন্—কী জনার্দন, তুমি এখনও যে বসে? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

জনার্দন বলে—আপনি বসে রইলেন, আমি কী করে খাই পণ্ডিত মশাই?

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—আমার জন্যে তুমি কেন বসে থাকো বলো তো জনার্দন? আমার জন্যে বসে থাকলে তোমার খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠবে। আমার কাজ কি কম?

জনার্দন বলে—কিন্তু শরীরটার দিকেও তো দেখবেন, মা-জননী বাড়িতে যে একলা না-খেয়ে বসে আছেন—

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—দূর, শরীরের কথা ভাবলে চলে? আগে কাজ, না আগে শরীর! তোমার মা-জননীকে তো তাই বলি যে, ইস্কুলটাকে একবার দাঁড়াতে দাও, তখন শরীরের কথা ভাববো—

তারপর একটু থেমে বলেন—এই ছ্যাখ্ না, ক্লাশ সিক্সের ছেলেরা এখনও শব্দরূপ লিখতে পারে না, অথচ ক্লাশে ঠিক উঠেছে—

জনার্দন বলে—আজ্ঞে, আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই শশধরবাবু, তিনি আবার বাড়িতে একটা কোচিন্ ইস্কুল খুলেছেন, সেখানে পনেরো টাকা করে মাইনে—

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—জানি জনার্দন, সবই জানি। একদিন দেবো সব ভেঙেচুরে ফেলে। আবার সেদিন দেখি, দেরি করে ইস্কুলে আসছে—

জনার্দন বলে—শশধরবাবু তো রোজই দেরি করেন পণ্ডিত মশাই—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই সবই জানেন। কোন্ মাস্টার কোচিং ক্লাশ করে, কোন্ মাস্টার দেরি করে আসে, কে দেরি করে ক্লাশে যায়, কী-রকম পড়ায়, গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর কিছু জানতে বাকি

নেই। তবু মুখ বুজে থাকেন তিনি। কাজ কি বকাঝকা করে! তার জন্যে ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট আছে, সেক্রেটারি আছে। কমিটি আছে, হেডমাস্টার ভবরঞ্জন আছে। তারাই দেখুক এখন। তাঁর তো বয়েস হয়ে গেছে!

—সেসব দিন-কাল বদলে গেছে পণ্ডিত মশাই!

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—মথুর সা' মশাইকে তোর মনে পড়ে জনার্দন?

তখন পুরোনো আমলের গল্প হয় দুই বৃদ্ধ মিলে। একজন কাজ করতে করতে গল্প করে যান, আর একজন গল্প করবার জন্যেই গল্প করে। তখন কোনও সমস্যার সমাধানের কথা নয়, কাউকে বকাবকিও নয়। যেন দু'জন সমান পর্যায়ে নেমে এসে বা সমান পর্যায়ে উঠে গিয়ে একাকার হয়ে গেছেন। বড় ভালো লাগে তখন দু'জনেরই। ঘণ্টা বাজানো নেই, গেট বন্ধ করা নেই, ছেলে-পড়ানো নেই। গৌর ভট্টাচার্যির বড় ভালো লাগে এই সময়টাতে। তখন ইস্কুলের পেছনের পুকুরটার দিক থেকে বেশ ঝিরঝির করে হাওয়া আসে, আম আর নারকেল গাছের পাতাগুলো তখন শিরশির করে কাঁপতে থাকে। গৌর ভট্টাচার্যি এক মনে তখন খাতা দেখতে থাকেন একটা-একটা করে। প্রত্যেকটি ছেলের নাম দেখেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সকলের চেহারাটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বলেন—জানো জনার্দন, আজকাল ছেলেদের লেখাপড়া তেমন ভালো হচ্ছে না—

জনার্দন বলে—ভালো কী করে হবে পণ্ডিতমশাই, আজকাল যে মাস্টার মশাইরা সবাই মিলে শশধরবাবুর বাসায় কোচিন্ ইস্কুল করেছেন—সব ছেলেরা সেইখানে যায় পড়তে—

—তুমিও দেখেছ নাকি?

জনার্দন বলে—আমি নিজের চোখে দেখেছি পণ্ডিত মশাই।

গল্প করতে করতে গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—তুমি এবার শুতে যাও জনার্দন, আর এই ক'টা খাতা দেখলেই আমার আজকের

মত শেষ। আমি ঘরে চাবি দিয়ে বাড়ি চলে যাবোখন—যাও, তুমি আর কত রাত করবে! যাও—

জনার্দন চলে যায় এক সময়ে। তারপর শেষ ক'টা খাতা দেখে নিয়ে তিনি ওঠেন। আলোটা নিভিয়ে দেন। ইলেকট্রিক আলো। আগে কত বছর তাঁর কেটেছে কেরোসিনের হারিকেন জ্বালিয়ে। এখন এত সুবিধে হয়েছে। তবু যেন চারদিকেই কাজের ফাঁকি বেড়েছে। কাজের সুবিধের জন্যেই এত যন্ত্রপাতি। কিন্তু যন্ত্রপাতি যেন আরো কাজের অসুবিধে বাড়িয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে কাঁধে চাদরটা নিয়ে দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে দেন। আর তারপর খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ান।

কিন্তু সেদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।

সেদিন খাতাপত্র দেখবার পর গৌর ভট্টাচার্যি বেরিয়েছেন। হঠাৎ দেখলেন পাশের ইস্কুল-বাড়িটার দোতলায় একটা ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত্রে আলো জ্বলছে কেন? মনে হলো সায়েন্সের ল্যাবরেটরির ভেতর যেন জ্বলছে আলোটা। তবে কি ল্যাবরেটরি-ঘরের আলো নেভাতে ভুলে গেছে জনার্দন?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই সিঁড়ি দিয়ে আবার ওপরে উঠতে লাগলেন। ওপরে উঠে আলোটা নিভিয়ে দেবেন।

কিন্তু অবাক হয়ে গেলেন ল্যাবরেটরিতে গিয়ে। নতুন সায়েন্স টীচার শিবেন্দু ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'চারজন ছেলেদের কী যেন বোঝাচ্ছে—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। নতুন ছোকরা মাস্টার। হায়ার সেকেণ্ডারি হবার পর সায়েন্স বিভাগ খোলা হয়েছে, তারই মাস্টার।

হঠাৎ নজরে পড়েছে শিবেন্দুর। সেও অবাক।

শিবেন্দু এগিয়ে এল পণ্ডিত মশাই-এর দিকে। বললে—পণ্ডিত-মশাই, আপনি?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—নিচের থেকে আলো দেখলাম।

ভাবলাম জনার্দন বুঝি আলো নেভাতে ভুলে গেছে। তা তুমি এতক্ষণ কী করছো?

শিবেন্দু বললে—এই এদের একটু পড়াচ্ছি পণ্ডিত মশাই—

—এরা কোন্ ক্লাশের ছেলে?

শিবেন্দু বললে—আজ্ঞে, এরা সব ক্লাশ নাইনে সবে ঢুকেছে, এ ছেলে ক'টির লেখাপড়ায় মন আছে, তাই একটু সময় করে নিয়ে শেখাচ্ছি। যদি এরা কিছু শিখতে পারে—

তারপর ছেলেগুলোকে বললে—এবার তোমরা যাও—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না না, আমি চলে যাচ্ছি, তুমি বরং শেখাও ওদের—

শিবেন্দু বললে—না, ওদের পড়া হয়েই গিয়েছিল পণ্ডিত মশাই, আমিও এবার যাবো—

ছেলেরা আস্তে আস্তে দু'জনকে নমস্কার করে চলে গেল।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তা খুব ভালো ছেলে তো এরা। তুমি এ-রকম রোজ রাত করে পড়াও নাকি?

শিবেন্দু বললে—প্রায়ই পড়াই। আর যখন দেখি ওদের আগ্রহ আছে, তখন ভাবি—যদি ওরা কিছু শিখতে পারে তো শিখবে। তাতে আমারও ভালো, ওদেরও ভালো। ছোটবেলায় আমাকে কেউ ভালো করে শেখায়নি। আমি খুব কষ্ট পেয়েছি, এখন ভাবি ওদের যেন আমার মত ভুগতে না হয়—

—তুমি বুঝি খুব কষ্ট পেয়েছ?

শিবেন্দু বললে—খুব। বাবা-মা কেউ ছিল না তো, পরের বাড়িতে থেকে মানুষ, ইস্কুলে ঠিকমত মাইনে দিতে পারিনি টাকার অভাবে—

গৌর ভট্টাচার্যি হঠাৎ একটা কাগজের ওপর আঁকাজোকা কী দেখে বললেন—ওটা কী?

শিবেন্দু এগিয়ে গেল সেদিকে।

—ও এটা? এটা ওই একটা এ্যাপারেটাসের নক্সা। ছেলেদের এঁকে বোঝাচ্ছিলুম।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই একমনে দেখতে লাগলেন নক্সাটা। এক বর্ণও মাথায় ঢুকলো না। নিজে বরাবর সংস্কৃত কাব্য, দর্শন পড়েছেন, স্মৃতি পড়েছেন। কিন্তু এসব কী জিনিস, কখনও দেখেননি। কখনও কেউ তাঁকে দেখায়ওনি। এও আর এক জগৎ। এ-জগতের খবর তিনি এতদিন রাখেননি। বোর্ড থেকে সংস্কৃত কম্‌পালসারি উঠিয়ে দেবার জন্যে মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। তখন মনে বড় ভয় হয়েছিল। মনে হয়েছিল, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি এ-সব না পড়লে ছেলেদের মানসিক গঠন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু আজ এই নক্সাটার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর যেন কেমন মনে হলো, হয়তো তাঁরই ভুল হয়েছিল। সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি ছাড়াও আরও অনেক জিনিস আছে যা তিনি জানেন না। হয়তো এই নক্সাটার মধ্যেও কোনও সত্য আছে।

—আচ্ছা শিবেন্দু, তোমার মত আরও তো একজন সায়েন্স টীচার আছে!

শিবেন্দু বললে—ভূধরবাবু আছেন, তিনি ফিজিক্স্ পড়ান—পদার্থবিদ্যা—

তিনিও কি তোমার মত এই রকম যত্ন নেন? তাঁকে তো কই দেখছি না।

শিবেন্দু চুপ করে রইল। খানিক পরে বললে—আমার মত তো তাঁর অত প্র্যাকটিক্যাল নেই, অনেক কম—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই যেন এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করছেন তখন।

বললেন—আমি এর এক বর্ণও বুঝতে পারছিনে শিবেন্দু; ভাবছি, তোমাদের এই রসায়নশাস্ত্র, এই পদার্থবিদ্যার মধ্যেও হয়তো কিছু সত্য আছে—

শিবেন্দু হাসল একটু। বললে—পণ্ডিত মশাই, সব জিনিসের মধ্যেই সত্য আছে। আপনাদের সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতির মধ্যে যেমন আছে, আমাদের এই কেমিস্ট্রি-ফিজিক্সের মধ্যেও তেমনি আছে।

সব ট্রুথই তো সেই একটা গ্রেটার ট্রুথের দিকে, সেই একটা মহা সত্যের দিকে, মহা ধ্রুবের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা যুগ যুগ ধরে, সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি সেই ইটারন্যাল ট্রুথের দিকেই নানা পথে পৌঁছোবার চেষ্টা করছি—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন শিবেন্দুর কথাগুলো। তার মনে হলো, এতদিন তিনি যা বিশ্বাস করে এসেছিলেন সেইটেই তাহলে পুরো সত্যি নয়। তাঁর জানার বাইরে কোথাও বোধহয় আরেকটা সত্য আছে, যা তিনি এতদিন জানতেন না, যা হয়তো এই শিবেন্দু জানে, যা হয়তো ওই ভূধর জানে। সেই সত্যের দিকেই যেন এই নক্‌সা ইঙ্গিত করছে। সেই সত্যের দিকেই যেন এই নক্‌সা এগিয়ে যেতে চাইছে।

—আচ্ছা আমি চলি শিবেন্দু। তুমি ঠিকই বলেছ! সত্যে পৌঁছবার অনেক পথ আছে। সে-পথ আমার সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতির মধ্যেও আছে। আবার তোমার বিজ্ঞানের মধ্যেও আছে···

তারপর নিজের মনেই আবার বলে উঠলেন—আচ্ছা আমি চলি, তুমি কাজ করো···

শিবেন্দু বললে—আমিও এবার যাবো পণ্ডিত মশাই—

বলে শিবেন্দু একটা সুইচ টিপে গ্যাস নিভিয়ে দিলে। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরের বারান্দায় বেরোল।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই রাস্তায় নামলেন। না, হয়তো হতাশ হবার কোনও কারণ নেই তাঁর। সবাই তো কোচিং স্কুল করেনি। শিবেন্দুর মত শিক্ষকও তো আছে।

শিবেন্দু সঙ্গে সঙ্গে আসছিল।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা শিবেন্দু, তুমি ওই শশধরবাবুর কোচিং স্কুলে পড়াও না?

শিবেন্দু বললে—না পণ্ডিত মশাই, না—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

শিবেন্দু বললে—ওতে ঠিক পড়ানো হয় না পণ্ডিত মশাই।

ঘণ্টা-মিনিট মেপে পড়ানো আর সাজেশান দিয়ে পাশ করানোতে আমি বিশ্বাস করি না। ওতে টাকা উপায় হয়তো হয়, কিন্তু ছাত্র মানুষ করা যায় না—। শশধরবাবু আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি রাজ হইনি—

—কিন্তু তবে যে সব ছাত্র ওখানে যায়?

শিবেন্দু বললে—তা যে যায় তাও জানি, কিন্তু তারা শিখতে যায় না, সস্তায় ফাঁকি দিয়ে পাশ করতে যায়। আমি নিজে কখনও জীবনে ফাঁকি দিইনি পণ্ডিত মশাই, তাই কাউকে ফাঁকি দিতে দেখলে বড় মন-খারাপ হয় আমার। তাই যে-সব ছাত্র সত্যিকারের পড়াশোনা করতে চায় তাদের আমি নিজে ল্যাবরেটরিতে ডেকে এনে ইস্কুলের পরে পড়াই—

—তা ছাত্ররা কি তোমায় এর জন্যে আলাদা কিছু টাকাকড়ি দেয়?

শিবেন্দু আবার হাসলো। বললে—না পণ্ডিত মশাই, টাকা দিলেও আমি নিতুম না। টাকার আমার খুবই দরকার পণ্ডিত মশাই, কিন্তু তাতে আমি নিজের কাছে ছোট হয়ে যেতুম। ইস্কুল থেকে আমি যা পাচ্ছি তাতেই আমি কোনও রকমে চালিয়ে নিই—

গৌর ভট্টাচার্যি আর থাকতে পারলেন না। শিবেন্দুর হাত দুটো হঠাৎ জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—শিবেন্দু, তোমাদের বিজ্ঞানের মধ্যেও যে এ আদর্শ আছে আমি জানতুম না, আমি ভাবতুম তোমাদের এই বিজ্ঞান বুঝি শুধুই জড়বাদ শেখায়। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি শিবেন্দু, তোমার সত্য তুমি যেন তোমার বিজ্ঞানের মধ্যে খুঁজে পাও—

শিবেন্দুও যেন খানিকক্ষণ অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি সেই রাস্তার মধ্যেই পণ্ডিত মশাই-এর দু'পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—বড় শান্তি পেলাম বাবা, বড় আশা পেলাম, তুমি দীর্ঘজীবী হও শিবেন্দু। জানো বাবা, নদীয়া

জেলার কীর্তি কাব্যালঙ্কার আমার পূর্বপুরুষ, সেই বংশে আমার জন্ম। আমি নবদ্বীপ থেকে কাব্যতীর্থ উপাধি পেয়েছি। যখন এখানে এলাম, দেখলাম যে সবাই মূর্খ, কেউ সংস্কৃত জানে না। ভাবতাম সংস্কৃত না জানলে বুঝি মনুষ্যজন্মই বৃথা। শাস্ত্র ছাড়া আর সবই বুঝি জড়বাদ। আমি সেই আদর্শে মানুষ। ছাত্র পড়াবো, কিন্তু অর্থ নেব না, নোট-বই লেখ[illegible]না। এ-যুগের যা পাপ তা আমি স্পর্শ করবো না। সেই জন্যে আজকের যুগের সকলের সঙ্গে আমার বিরোধ শিবেন্দু। কিন্তু সে-পাপ তো আমি রোধ করতে পারিনি। পৃথিবীর সকলে তাদের নিজের নিজের রুচি মেনে চলেছে। আমার কথা তো কেউ শোনেনি। আমার গৃহিণী পর্যন্ত আমার ওপর অবিচার করেন, আমি যথেষ্ট টাকা উপায় করি না বলে। কিন্তু তুমিই বলো, এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব, সততা, সত্যবাদিতা, ধর্ম, সব কি মিথ্যে, আর টাকাটাই কি সব? যার টাকা নেই, কিন্তু মনুষ্যত্ব আছে, সততা আছে, সে কী পরিত্যাজ্য? তোমাদের বিজ্ঞানে কী বলে শিবেন্দু? তোমাদের বিজ্ঞানেও কি তাই বলে?

শিবেন্দু বললে—ভুল কথা পণ্ডিত মশাই, ভুল কথা। বিজ্ঞান মানে জড়বাদ নয়—

—জড়বাদ নয়? এই বাস্তব সংসারের বাইরে যে আর একটা পৃথিবী আছে সেটা তাহলে তোমরা মানো? যুক্তিতর্কের অতীতকেও তোমরা স্বীকার করো?

শিবেন্দু বললে—আমরা কিছুই অস্বীকার করি না পণ্ডিত মশাই। বিজ্ঞান মানে তো আপনি জানেন, আপনাকে আমি আর কী বোঝাবো। এই যেমন ধরুন জ্ঞান। জ্ঞান কাকে বলে? রামকৃষ্ণদেব তো ভক্তিবাদের লোক। তিনিই বলেছেন, দুধ খেলে যে স্বাস্থ্য ভাল হয়, এটা যে জানে সে হলো জ্ঞানী, আর দুধ খেয়ে স্বাস্থ্য ভাল হয়, এটা জেনে যে দুধ খেয়ে স্বাস্থ্য ভালো করেছে, সে হলো বিজ্ঞানী—

ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছে শিবেন্দু।

সে হঠাৎ বললে—আপনি বাড়ি যাবেন না পণ্ডিত মশাই?

আপনি তো অন্য দিকে অনেক দূর চলে এসেছেন—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—ও, তা হোক, তা হোক, দেখ শিবেন্দু, ভক্তিযোগ আর জ্ঞানযোগ—ও দুটোর সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই সত্যে পৌঁছতে হয়, এই-ই তো তোমার বক্তব্য ?

শিবেন্দু বললে—অনেক রাত হয়ে গেছে পণ্ডিত মশাই, চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—না না, আমি একলা যেতে পারবোখন। এখন যে-কথা বলছিলুম, তোমাদের বিজ্ঞানটা তাহলে বলো জ্ঞানযোগ ?

—পণ্ডিত মশাই, এ-সম্বন্ধে অন্য দিন না-হয় কথা হবে।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমারও তো দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার সারাজীবনই এই রকম গেল…

বলে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পেছন থেকে শিবেন্দু বললে—আর একটা কথা পণ্ডিত মশাই—

—কী কথা ? বলো ?

—আমার ল্যাবরেটরির কিছু এ্যাপারেটাস কেনার দরকার ছিল।

—এ্যাপারেটাস ? তা কিনবে বৈকি, নিশ্চয়ই কেনা তো উচিত। ভবরঞ্জনকে বলো। ভবরঞ্জন বড় ভালো ছেলে—

শিবেন্দু বললে—আমি ভবরঞ্জনবাবুকে বলেছিলাম, আজকে এক বছর ধরে বলছি কিন্তু কিছুই করছেন না—

—কেন, করছেন না কেন ?

—বলছেন ফাণ্ডে টাকা নেই।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—সে কী ? টাকা নেই ? কেন ? অত টাকা আদায় হচ্ছে ছেলেদের মাইনে থেকে, গভর্মেণ্টও টাকা দিচ্ছে, টাকা থাকবে না কেন ? গেল কোথায় টাকা ? তাহলে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, কমিটি, ওরা কী করছে ?

শিবেন্দু বললে—তা জানি না। উনি বলছিলেন টাকার অভাবে টীচারদের মাইনে বাড়ানো যাচ্ছে না, ছাত্রদের মাইনে না বাড়ালে আর চলছে না—। ছাত্রদের যখন মাইনে বাড়বে, তখন কেনা হবে—

—না না না,—গৌর ভট্টাচার্যি মশাই আপত্তি করে উঠলেন। বললেন—না-না, সে কী করে হয়? টাকার জন্য শিক্ষা আটকে থাকবে? সে কখনও হয়? সে তো হতে পারে না—আচ্ছা ঠিক আছে, আমিই ভবরঞ্জনকে বলবো, ছি ছি, এ্যাপারেটাস না কিনলে চলবে কী করে?

শিবেন্দু বললে—আমার কথা যেন বলবেন না পণ্ডিত মশাই, তাহলে আমার ওপর রাগ করবেন হেডমাস্টারমশাই—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—সে আমি যা বলবার তা বলবো, তুমি ভেবো না। বলে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

শিবানী প্রতিদিনকার মত রান্নাবান্না সেরে বসে ছিল। সারা দিনে কী-ই বা তার কাজ। রানী চলে গেছে অনেকক্ষণ। তারপর শম্ভুর মা'ও কাজকর্ম সেরে চলে গেছে নিজের বাড়িতে। তারপরেই ফাঁকা হয়ে গেছে বাড়িটা। এই সময়ে বাড়িটা রোজ ফাঁকা হয়েই যায় শিবানীর কাছে। হয়তো এক ফাঁকে মনে পড়ে মেয়ের কথা। মনে পড়লেই মনটা হু-হু করে ওঠে শিবানীর। বিয়ের আগে অবন্তীকে নিয়ে অন্তত সময়টা কেটে যেত। উনি তো [illegible] থেকে শুধু ইস্কুল আর ইস্কুল নিয়েই ব্যস্ত। শিবানীর সময় কাটতো ওই অবন্তীকে নিয়ে।

ছোট বেলায় বড় কাঁদুনে ছিল মেয়ে। তখন কত দিন রাগ

করে চড়-চাপড় মেরেছে শিবানী। যত চড় খেতো অবন্তী তত জোরে কেঁদে উঠতো।

পাশের বাড়ির মুখুজ্জে গিন্নী বলতো—কেন বউ, মেয়েকে তুমি অত মারো কেন বলো তো?

বলে মুখুজ্জে গিন্ন অবন্তীকে কোলে করে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যেত ভোলাতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে মেয়ে আরও কাঁদতো। মুখুজ্জে গিন্নী আবার খানিক পরেই মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

বলতো—নাও বউ, তোমার মেয়ে নাও, মা এত মারে তবু মেয়ের সেই মা'র কাছেই আসা চাই। কেবল বলে—মা'র কাছে যাবো। আহা, মা এমন জিনিস—

সেই মুখুজ্জে গিন্নী আর নেই। অষ্টমী পুজোর দিন হঠাৎ পেটে ব্যথা হয়ে মারা গেল মুখুজ্জে গিন্নী।

অবন্তী তখন ছোট। কিছুই বুঝতে পারেনি সে। সে জিজ্ঞেস করতো—দিদিমা কোথায় গেল মা? দিদিমা আসে না কেন?

শিবানী কিছুতেই মেয়েকে বোঝাতে পারতো না যে, মরার পর মানুষ যেখানে যায় সেখান থেকে আর সে ফেরে না।

হঠাৎ খুট-খুট করে দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

শিবানী বললে—কে রে? ফটিক?

উত্তর দিলে না কেউ। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই দেখে, সত্যিই ফটিক। ফটিক দাঁত বার করে হাসছে।

—কী রে, এত দেরি হলো যে তোর? কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ফটিক তখনও হাসছে। বললে—দাদু এখনও আসেনি তো দিদিমা?

শিবানী বললে—তুই কোথায় ছিলি তাই বল আগে—

ফটিক ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে। বললে—জানো দিদিমা, আজ একজনকে খুব ঠকিয়েছি···

শিবানী বললে—হুঁ, সেই দোকানদারটা যে এসেছিল—

—এসেছিল? তুমি তাকে টাকা দাওনি তো?

—আমি দিইনি, রানী দিয়েছে।

ফটিক বললে—ঠিক হয়েছে, আমি তাকে বললুম, স্থশীলদের বাড়ি যেতে, সে হারামজাদা কিনা তোমার কাছে এসেছে। দিদির টাকা গেছে বেশ হয়েছে! জানো দিদিমা, দিদির বাক্সে অনেক টাকা আছে, দিদি এত কিপ্‌পন না, কাউকে একটা পয়সা দেবে না, শুধু জমিয়ে রাখবে—

শিবানী তখন ফটিকের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়েছে একেবারে।

ফটিক হাতের বইগুলো তখন ঘরের ভেতরে রাখতে গেছে। সেখান থেকেই বললে—আজকে আমি আর খাবো না দিদিমা, আমার পেট ভরে গেছে—

শিবানী বললে—তুই একবার এদিকে শোন, শোন এদিকে—

ফটিক এসে শিবানীর সামনে দাঁড়ালো। বললে—কী?

শিবানী বললে—তুই ভেবেছিস কী? কেন তুই ইস্কুল থেকে বাড়িতে এলি নে, তাই বল? নৌকো নিয়ে কোথায় গিয়েছিলি?

এতক্ষণে যেন ফটিক নিজের অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলো।

—কথা বলছিস না কেন, বল, উত্তর দে?

ফটিক বললে—বা রে, আমাকে তুমি বকছো কেন? স্থশীলকে বকতে পারো না? স্থশীলই তো আমাকে নৌকো চড়তে বললে—

—স্থশীল নৌকো চড়তে বললে, আর তুইও নৌকো চড়তে গেলি? আর পকেটে টাকা নেই তবু স্থশীলের কথায় তুই চপ-কাটলেট খেলি?

ফটিক বললে—সত্যি বলছি দিদিমা, মা-কালীর দিব্যি বলছি, স্থশীলই আমাকে হোটেলে খেতে নিয়ে গেল।

শিবানী বললে—এখন যদি তোর দাত্বর কানে তুলি কথাটা?

ফটিক বললে—তোমার পায়ে পড়ি দিদিমা, দাত্বকে বোল না, আমি আর কখনও করবো না—

শিবানী বললে—এ-কথা তখন মনে ছিল না? সুশীল যখন তোকে ডেকে নিয়ে গেল, তখন দাদুর কথা মনে ছিল না?

ফটিকের কান্নাভরা মুখখানা দেখে হঠাৎ যেন শিবানীর চোখের সামনে মেয়ের মুখখানা ভেসে উঠলো। ঠিক যেন মায়ের মুখ বসিয়ে রেখেছে। শিবানীর বুকেও একরাশ কান্না ঠেলে উঠলো। বললে—ওরে হতভাগা, এতদিন ধরে দাদুর কাছে থেকে থেকে তোর এতটুকু জ্ঞান হলো না? এই তোর শিক্ষা হয়েছে? দাদু যখন শুনবে তখন তোকে যে মেরে খুন করে ফেলবে রে, আমি তখন তোকে কী বলে ঠেকাবো?

বলতে বলতে শিবানী ফটিককে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। শিবানীর মনে হলো যেন ফটিক নয়, অবন্তীই তার কোলে মুখ গুঁজে রয়েছে! সেইভাবে জড়িয়ে ধরেই শিবানী বলতে লাগলো—তোর দাদুর কত সাধ রে তোকে মানুষ করবে, তুই জলপানি পাবি, আর সেই তোর এই কীর্ত্তি?

বলরামপুরের সমস্ত বাতাস যেন শিবানীর সঙ্গে একযোগে সেই মুহূর্তে কেঁদে উঠলো। সামনের পুকুরের বুকে যেন হঠাৎ একটা ঢেউ উঠলো আর পাশের শিরীষ গাছটার পাতাগুলো ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় একসঙ্গে শির শির করে উঠলো।

সুশীলও তখন নিঃশব্দে টিপিটিপি পায়ে বাড়ি ঢুকছে।

—কে রে?

সামনের দরজার পাশের ঘরে মক্কেলদের নিয়ে বসে ছিল বাবা।

সেখান দিয়ে না ঢুকে, খিড়কি দিয়ে ঢুকলো সুশীল। পড়ার ঘরে তখন শশধরবাবু বসে আছেন। রোজকার মত শশধরবাবু

পড়াতে এসেছেন। সুশীল সে-দিকেও ঢুকলো না। তার পাশের গলিটা দিয়ে পর্দার আড়ালে সুশীল একেবারে তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

—কে রে?

দিদির একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেছে সুশীল।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ধরা পড়ে গিয়ে সুশীল থমকে দাঁড়ালো। বললে—বা রে, আমাকে বকছো কেন? আমি কী করেছি?

—কী করেছি? আবার ন্যাকামি হচ্ছে? ইস্কুল থেকে বাড়ি আসিসনি কেন? কোথায় গিয়েছিলি বল? না বললে, আমি এখ্‌খুনি বাবাকে বলে দিচ্ছি গিয়ে—

সুশীল থমকে দাঁড়ালো। বললে—ফটিকের সঙ্গে গিয়েছিলুম—

—কোথায় গিয়েছিলি?

সুশীল বললে—বীরগঞ্জের মেলায়।

—সেখানে কী করতে গিয়েছিলি?

সুশীল বললে—খেতে—

—খেতে মানে?

সুশীল বললে—আমি খেতে চাইনি দিদি। ফটিক বললে, কাটলেট খাবে। তাই আমিও খেয়েছি।

—দাম দিলে কে?

—সব দাম দিইনি। আমার কাছে শুধু একটা টাকা ছিল।

রানী বললে—তোর কাছে টাকা এল কোত্থেকে? কে তোকে টাকা দিলে?

সুশীল ভয়ে ভয়ে রানীর দিকে চাইলে। তারপর বললে—তোর বাক্স থেকে নিয়েছিলুম দিদি—

রানী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। সুশীলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে যেন তাকে ভয় দেখালো।

সুশীল ভয় পেয়ে একেবারে দিদির দিকে অনুনয়-বিনয়ে নিচু

হয়ে বললে—তুই কাউকে বলিস না দিদি। ফটিক আমাকে তোর বাক্স থেকে টাকা চুরি করতে বলেছিল। আমার দোষ নেই, ফটিকের দোষ।

—তারপর? ক' টাকার খেইছিলি?

—চার টাকা সাত আনা।

—বাকি তিন টাকা সাত আনা কে দিলে?

সুশীল বললে—দিতে পারিনি। দোকানদার আমাদের পুলিশে দিচ্ছিল। শেষকালে আমার বাবার আর পণ্ডিত মশাই-এর নাম করাতে তারা আমাদের ধরে নিয়ে এল। তারপর তুই টাকা না দিলে আমাদের ঠিক পুলিশে দিয়ে দিত—তুই বাবাকে কিচ্ছু বলিসনি তো—

রানী আর কিছু বললে না। শুধু বললে—যা, তোর মাস্টার-মশাই নিচে অনেকক্ষণ বসে আছেন, যা, পড়গে যা—

সুশীল যেন ছাড়া পেয়ে বাঁচলো। তাড়াতাড়ি একছুটে নিচেয় চলে গেল।

—ওরে ফটিক, ফটিক!

বাইরের সদর দরজাটা খুলে দিলে শিবানী। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বড়-বৌকে দেখে একটু আশ্চর্য হলেন। বললেন—তুমি যে? ফটিক বুঝি ঘুমোচ্ছে?

শিবানী কিছু কথা না বলে আবার সদর দরজা বন্ধ করে দিলে।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই ঘরে যেতে যেতে বললেন—জানো বড়-বৌ, আমি ভাবতাম বিজ্ঞান বুঝি জড়বাদ, তা নয় গো। আসলে ওরাও যা চায়, আমরাও তা চাই। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে…

গৌর ভট্টাচার্যি খাতাগুলো রাখলেন তক্তপোষের ওপরে, চাদরটা ঝুলিয়ে দিলেন আলনাতে। তারপর কাপড়-জামা বদলাতে লাগলেন।

—ওই যে আমাদের ইস্কুলে শিবেন্দু বলে একজন মাস্টার এসেছে, সে দেখি কিনা আজ রাত্তির পর্যন্ত ছেলেদের নিয়ে পড়াচ্ছে গো। আমি তো অবাক। আমি তোমাকে বলেছিলাম না সবাই ফাঁকি দেয় আজকাল? না গো, দেখে আমার খুব আনন্দ হলো। তার সঙ্গেই তো এতক্ষণ···

ততক্ষণে তিনি গাড়ু নিয়ে মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিয়েছেন। নিয়ে খেতে বসেছেন।

—আমরা নবদ্বীপে স্মৃতি পড়েছি ন্যায় পড়েছি, কিন্তু দেখলাম শিবেন্দুও কম পড়েনি গো। বেশ মেধাবী ছেলে। আমি এতদিন ভাবতাম, কোচিং ইস্কুলে সবাই বুঝি কেবল মাস্টারি করছে আর টাকা উপায় করবার ফন্দি আঁটছে···

খেতে খেতে গল্প করতে লাগলেন পণ্ডিত মশাই।

বললেন—মনে মনে বড় দুঃখ ছিল, জানো বড়-বৌ, গভর্মেণ্ট থেকে কম্পালসারি সংস্কৃতটা তুলে দিলে, জড়-বিজ্ঞান শুরু করে দিলে। কিন্তু দেখলাম···

এতক্ষণে শিবানী কথা বললে। বললে—তুমি শিগ্‌গির খেয়ে নাও, পরে কথা বোল। তুমি খেয়ে নিলে তবে তো আমি খাবো আবার···

এতক্ষণে যেন খেয়াল হলো পণ্ডিত মশাইয়ের।

বললেন—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে ওই শিবেন্দুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেরি হয়ে গেল কিনা···

বলে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে নিলেন।

বিছানায় তখন শুয়ে পড়েছেন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই। তখনও মাথার মধ্যে ঘুরছে শিবেন্দুর কথাগুলো। ছেলেটা ভালো তো অত রাত্তিরেও পড়াচ্ছিল—

—হ্যাঁ গো, ফটিক আজকে পড়তে বসেছিল ?

শিবানী তখন পাশের ঘরে ফটিকের পাশে শুয়ে জেগে আছে। তখনও ঘুম আসেনি তার। হয়তো ফটিকও জেগে ছিল তখন। কিন্তু কেউই উত্তর দিলে না। কোনোদিকে কারো সাড়াশব্দ নেই। একা অনেকক্ষণ জেগে রইলেন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই। কেবলই মনে পড়তে লাগলো শিবেন্দুর কথাগুলো। শিবেন্দু ঠিকই বলেছে হয়তো। শিবেন্দুরা আজকালকার ছেলে। হয়তো ওর কথাই ঠিক। আস্তে আস্তে কখন অজ্ঞাতে তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন।

কোথায় যেন একটা গ্রন্থি ছিল। কারোর নজরে পড়েনি বলেই গৌর ভট্টাচার্যি মশাই এতদিন মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিলেন। প্রাণপণে উদয়াস্ত খাটতেন স্কুলের পেছনে। গৃহিণীর দিকে কখনও নজর দেননি। নিজের মেয়ের দিকে নজর দেননি। ছাত্রদের জন্যে নোট লিখে পয়সা উপায় করবার কথা ভাবেননি। এমন কি অন্য সব টীচাররা যখন টিউশানি করে, কোচিং স্কুল করে বাড়ি তুলে ফেললে, অবস্থা ফিরিয়ে ফেললে, তখনও তিনি স্কুলের কথাই ভেবেছেন, স্কুলের ছাত্রদের কথাই ভেবেছেন।

সেদিন কমিটির মিটিং-এ কথাটা তুললে প্রেসিডেন্ট নিমাই সা'।

নিমাই সা' বললে—আপনারা সবাই স্কুলের আয়-ব্যয়ের সমস্যার কথা জানেন। নানা কারণে আমাদের ব্যয় বেড়ে গেছে। এর ওপর টীচাররা সবাই দরখাস্ত করেছেন তাঁদের মাইনে বাড়াবার জন্যে। সকলের মাইনের স্কেল যদি এই অবস্থায় বাড়াতে হয় তো আমাদের নতুন কোনও আয়ও বাড়াতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি, ছাত্রদের টিউশান ফিস্ যদি এক টাকা করে বাড়ানো যায় তাহলেই কেবল এই

সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়—

একজন মেম্বার বললেন—কিন্তু এই দুর্মূল্যের দিনে অভিভাবকদের ওপর চাপ দেওয়া কি উচিত হবে?

নিমাই সা' বললে—মাত্র এক টাকা বাড়ালে কি খুব চাপ দেওয়া হবে? আজ কোন্ জিনিসটার দাম না বেড়েছে? আমি তো জন্ম থেকে কারবার করছি। আমাদের তিন পুরুষের দোকান। আগে যে-জিনিসটা যে-দামে কিনেছি তার তিন গুণ দাম হয়েছে আজ। কিন্তু আমাদের স্কুলের মাইনে সেই সেকালে পণ্ডিত মশাই যা করে গিয়েছিলেন তাই-ই আছে। আমার তো মনে হয় এতে কোনও গার্জিয়ানের কোনও আপত্তি হবার কথা নয়—

সবাই চুপ করে রইলেন।

সেক্রেটারি নরেন চক্রবর্তী বললেন—তাহলে পণ্ডিত মশাইকে একবার ডাকলে হয় না এখানে?

এতক্ষণে সবাই যেন একটু সমর্থন করার মত ইঙ্গিত করলে। বললে—তা মন্দ হয় না। বলতে গেলে তাঁরই তো স্কুল। তাঁর অজ্ঞাতে এত বড় একটা ডিসিশন নেওয়া কি ঠিক হবে?

নিমাই সা' বললে—তাঁর স্কুল মানে কী? যতক্ষণ কমিটি আছে, ততক্ষণ এ স্কুল কমিটির আণ্ডারে। এর পলিসি যা-কিছু সব ঠিক করবে কমিটি। কমিটি বড়, না পণ্ডিত মশাই বড়? বাস্তব অবস্থা বড়, না সেন্টিমেণ্ট বড়? সেন্টিমেণ্ট নিয়ে সংসার করা চলে না—

নরেন চক্রবর্তীর জিনিসটা ভালো লাগছিল না। বললে—তুমি ডাকো না একবার পণ্ডিত মশাইকে। হাজার হোক, তিনিও তো এই স্কুল নিয়ে ভাবেন—

শেষ পর্যন্ত সকলের মতেই মত দিলে নিমাই সা'। বললে—তাহলে তাই হোক, তাঁকে ডাকা হোক—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই এলেন। সবাই সসম্ভ্রমে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালে। তিনিও সব যুক্তি শুনলেন। স্কুলের আয়-ব্যয়ের কথা বুঝলেন। বোর্ডের গ্র্যাণ্টের অবস্থাও শুনলেন।

বললেন—আমার মতে ছাত্রদের মাইনে বাড়ানো এখন ঠিক হবে না—

নিমাই সা' বললে—তাহলে টীচারদের মাইনে কী করে বাড়ানো যাবে তাই বলুন। তারপরে আমরা আপনার কথা মেনে নেব।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—টীচারদের মাইনে কি বাড়াতেই হবে? আমিও তো এ-স্কুলে একজন টীচার, কই, আমি তো কখনও আমার মাইনে বাড়াতে বলিনি—

সেক্রেটারি নরেন চক্রবর্তী বললে—না মাস্টার মশাই, কথাটা হচ্ছে দিনকাল তো খুব খারাপ আজকাল, এই অবস্থায় সকলেরই খরচ বেড়েছে, আয় সেই আগেকার মত একই রয়েছে। তাই তাদের মাইনে বাড়ানোর অনুরোধ অন্যায় নয়।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—সবই বুঝলাম, কিন্তু গাঁয়ের মানুষ ছেলেদের মাইনে দেবে কোত্থেকে? অভিভাবকদের মাইনে বেড়েছে, না তাদের আয় বেড়েছে? আমার কাছে রোজ কত ছেলের বাবা-মা আসে জানো? তারা রোজ ছেলেদের জন্যে ফ্রি-শিপের দরখাস্ত করে! আমি তাদের কী বলে বোঝাই?

নিমাই সা' বললে—তা তো সবই বুঝলাম মাস্টার মশাই, কিন্তু ইস্কুল চলে কী করে? আগে তিন টাকা রাজমিস্ত্রীর রোজ ছিল, এখন হয়েছে সাত টাকা। ছেলেদের আরো দুটো ঘর তৈরি করতে হবে। বসবার জায়গা নেই তাদের। ঘেঁষাঘেঁষি করে এক-একটা ক্লাশে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনকে বসতে হয়। তারপরে স্টাফের প্রশ্ন। একা হরলালবাবুকে দিয়ে অত কাজ আর হচ্ছে না। তার একটা এ্যাসিস্‌টেণ্ট দরকার। এসব টাকা আসে কোত্থেকে?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—সবই তো বুঝলুম। তা এ-সব ব্যাপার তো একদিন আমিও করেছি। তখন একা আমি স্কুল চালিয়েছি। তখনও ছেলে কিছু কম ছিল না। তোমরাও তো এই স্কুলে তখন পড়েছ। তোমরা জানো না ক'জন কর্মচারী ছিল এই স্কুলে? টাকার অভাব হয়েছে কতবার! কই, তখন তো আমি ছাত্রদের

ঘাড় ভেঙে টাকা আদায় করিনি।

নরেন চক্রবর্তী বললে—মাস্টার মশাই, সে-যুগের কথা আলাদা। তখন···

কথা আর বাড়াতে দিলেন না গৌর ভট্টাচার্যি মশাই।

বললেন—আলাদা কেন? তোমরা সব কথাতেই সে-যুগ সে-যুগ বলে উত্তর এড়িয়ে যাও। সে-যুগ কেন আলাদা হবে শুনি? তখনও আমরা ভাত খেতুম, এখনও আমরা ভাত খাই। সে-যুগেও মানুষের দুটো হাত দুটো পা, দুটো চোখ ছিল। এখনও তাই-ই আছে। এখন কি আমাদের সব চারটে করে হাত-পা-চোখ গজিয়েছে বাপু? তখনও ষোল আনায় টাকা হতো এখনও সেই ষোল আনাতেই টাকা রয়েছে। ও-সব আসলে তোমাদের বাড়াবাড়ি। কাজ করতে ইচ্ছে করলেই কাজ হয়। আসলে আমরা কেউ কাজ করবো না। শুধু শুধু বসে বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে মাইনে নেব। তাহলে কাজ কী করে হবে? আর টাকা?

টাকার কথা বলছো তোমরা! তখনও তো টাকার অভাব হয়েছে আমার। যখনই অভাব হয়েছে, আমি মথুর সা' মশাই-এর কাছে গিয়ে হাত পেতেছি। চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে গিয়ে হাত পেতেছি। তাঁরা দরকারের সময়ে টাকা হাওলাত দিয়েছেন ইস্কুলকে, তারপর যখন আবার আমার শোধ দেবার মত অবস্থা হয়েছে, তখনই শোধ দিয়ে দিয়েছি। তা এখন যদি তোমাদের টাকার দরকার হয়েই থাকে তো তুমি রয়েছ, নরেন রয়েছে, তোমরা টাকা স্কুলকে হাওলাত দাও—তারপর যখন ইস্কুলের আয় বাড়বে, বোর্ড থেকে টাকা আসবে, তখন তোমাদের টাকা নিয়ে নিও।···

নিমাই সা' বললে—কিন্তু পণ্ডিত মশাই, কমিটির সমস্ত মেম্বাররা চাইছে মাইনে বাড়ুক···

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই যেন আগুন হয়ে গেলেন।

বললেন—তোমাদের কমিটির মেম্বাররাই যদি তাই চায় তো তোমরা তাই-ই করো। তবে আর আমাকে ডাকছো কেন? আমি

কে? আমাকে কেন আবার জিজ্ঞেস করতে ডেকেছ? তোমাদের এ-সবের মধ্যে নেই আমি···

হঠাৎ ক্লাশের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

পণ্ডিত মশাই আর দাঁড়ালেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

সেদিন হঠাৎ ঘরের বাইরের দিকে নজর পড়তেই গৌর ভট্টাচার্যি মশাই দেখলেন, কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

বললেন—কী চাই? কে? ও, সন্তোষবাবু!

সন্তোষবাবু সংসারী ছা-পোষা মানুষ। ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকলেন।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—কী? ফ্রি-শিপ নাকি? ও-সব আমার কাছে আর হবে না; সে যুগ আর নেই সন্তোষবাবু। এখন মানুষের চারটে করে হাত-পা-চোখ গজিয়েছে। এখন আর দয়া-মায়া-সহানুভূতি পাবেন না কারো কাছে। যতদিন আমি ছিলাম ততদিন অনেক দয়া-মায়া করেছি। এখন ইস্কুলের ব্যয় বেড়ে গেছে, আয় কমে গেছে। ও-সব আমি পারবো না আর। আপনি সেক্রেটারিবাবুর কাছে যান, প্রেসিডেন্টবাবুর কাছে যান—

বলে আবার নিজের কাজে মন দেবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু সন্তোষবাবু তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

বললে—আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, তা নয়।

—তা নয় তো কী?

—আজ্ঞে, আমার ছেলে এবার প্রমোশন পায়নি।

—কেন প্রমোশন পায়নি? কোন্ বিষয়ে ফেল করেছে?

—আজ্ঞে, তিনটে বিষয়ে ফেল করেছে।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই রেগে গেলেন।

বললেন—আপনার কী-রকম আক্কেল সন্তোষবাবু? এটা ইস্কুল না ছেলেখেলা? তিনটে বিষয়ে ফেল করেছে আপনার ছেলে আর আপনি প্রমোশন চাইতে এসেছেন সেই ছেলের? আপনার ছেলের কিছ্ছু হবে না। ওই নিমাই সা'র মুদিখানায় কয়ালের কাজ করবে। আর এক বছর পড়ুক। ফেল করা ভালো। একটু ভুগুক আপনার ছেলে, তবে শিক্ষা হবে তার—

সন্তোষবাবু বললেন—আজ্ঞে, আমার ছেলে লেখাপড়া কিছু করতে পারেনি অসুখের জন্যে—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না না, আমি পারবো না, আমি পাশ করাতে পারবো না, আপনি হেডমাস্টারের কাছে যান—

সন্তোষবাবু বললেন—আজ্ঞে, আপনি একটু বললেই হেড-মাস্টার মশাই রাজী হয়ে যাবেন—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—আমি কেন বলতে যাবো? আপনার ছেলের জন্যে আমি কেন বলতে যাবো? একজামিনের আগে কি আপনার ছেলে আমার কাছে এসেছিল পড়বার জন্যে? এখন যান, এখন আমার কাজ আছে, আমি আর আপনার সঙ্গে বাজে কথা বলতে পারবো না মশাই। আমার সময় নেই—

বলে নিজের কাজে মন দিলেন।

সন্তোষবাবু ছা-পোষা লোক। নেহাত গোবেচারী কেরানী মানুষ। বলরামপুর থেকে রোজ ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন। হতাশ হয়ে ফিরলেন। ফিরে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের দিকে গেলেন। মাঠ মানে বাগান। নারকেল আর আমগাছের বাগান। সেখানেই বিরাট পুকুরটা। পুকুরের পাড়ে বলাইবাবু দাঁড়িয়ে ছিল। বললে —কী হলো সন্তোষবাবু?

সন্তোষবাবু কাছে গিয়ে বললেন—না বলাইবাবু, হলো না—

—কেন? কি বললেন পণ্ডিত মশাই?

সন্তোষবাবু বললেন—সে একেবারে রেগেমেগে একাকার।

বললেন—হেডমাস্টারের কাছে যান, আমি কে? আমি কেউ নই ইস্কুলের—

বলাইবাবু বললেন—মশাই, আমি আপনাকে কতদিন বলিচি আমাদের কোচিং স্কুলে দিন ছেলেকে। পাশের জন্যে ভাবতে হবে না। তখন তো তা শুনলেন না—

—কিন্তু একটা বছর তো নষ্ট হবে?

—তা নষ্ট হলে আর কী হবে? শেষকালে যে একেবারে আখেরটাই নষ্ট হয়ে যাবে, তখন?

—কোচিং ইস্কুলটা কোথায়?

—আরে, আপনি শশধরবাবুর কোচিং ইস্কুলটা চেনেন না? তা শশধরবাবুর বাড়ি চেনেন?

সন্তোষবাবু বললেন—তা চিনি—

বলাইবাবু বললেন—সেই শশধরবাবু নিজের বাড়িতেই তো ইস্কুল করেছেন। আমরা সব পড়াই।

—কত মাইনে?

—তিরিশ টাকা।

তিরিশ টাকা শুনে যেন লাফিয়ে উঠলেন সন্তোষবাবু। বললেন—অত টাকা মাসে মাসে আমি কোত্থেকে দেবো বলাইবাবু? আমি ছা-পোষা মানুষ, আড়াই শো টাকা মাইনে পাই। ওই তিরিশ টাকা, তারপরে আছে ইস্কুলের মাইনে, খাওয়া-পরা জামা-কাপড়। আর ওই একটা ছেলের পেছনেই যদি অত টাকা বেরিয়ে যায় তো অন্য ছেলেমেয়েরা কী করবে বলাইবাবু? তাদেরও তো খরচ আছে···

বলাইবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—তাহলে অত কথা ছেলে হওয়ার আগেই ভাবা উচিত ছিল আপনার!

সন্তোষবাবু তারপর আর দাঁড়ালেন না সেখানে। অন্যদিকে চলে গেলেন।

ইতিহাসের কোনও নিয়ম-কানুন না থাকলেও একটা আদি নিয়ম আছেই। -সে নিয়মে একজন যায় এবং তার জায়গায় আর একজন আসে। কিন্তু গৌর ভট্টাচার্যি মশাই মুখে বললেও ওই ইস্কুল ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারতেন না, কোথাও যেতে তাঁর ভালোও লাগতো না। ঘুরে-ফিরে ওই স্কুলের নিজের ঘরটার মধ্যে এসেই যেন তিনি শান্তি পেতেন।

কেউ এলে ওই ঘরটিতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হতো।

রানী বলতো—দাদু, তাহলে তুমি বুঝি বাড়িতে কেবল খেতে আর শুতে আসো?

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—না রে, নিজের হাতে গড়েছি তো, তাই বড় মায়া পড়ে গেছে আমার।

রানী বলতো—বা রে, আর আমাদের ওপর বুঝি তোমার মায়া নেই?

গৌর ভট্টাচার্যি হাসলেন—আরে, তুই তো হলি আমার নাতনি, তোর ওপর মায়া তো থাকবেই। তাছাড়া তোর বাবা আছে মা আছে, আমি আছি, সবাই মিলে তোকে আমরা ভালবাসি। কিন্তু ইস্কুলটার কে আছে বল তো? ইস্কুলটার বাবা আছে না মা আছে? না দাদু আছে?

রানী বলতো—বাঃ, ইস্কুলটার তো তুমি আছ!

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আমি কি আর আজকাল অত দেখতে পারি রে আগেকার মতন? জানিস রানী, কেউ আমার ইস্কুলটাকে দেখবার নেই রে। মাস্টাররাও দেখে না, ছেলেরাও না।

রানী বলতো—না, আমার বাবা তো দেখে, বাবা তো সেক্রেটারি—

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—তোর বাবা সেক্রেটারি হলে কী হবে? সে তো ছেলেমানুষ। কমিটির সবাই তো ছেলেমানুষ! আর ওদেরও তো নিজের নিজের কাজকর্ম আছে! ইস্কুল নিয়ে ভাববার সময় তো কারো নেই। নিজের কাজকর্ম করে যখন সময় পায় তখন ইস্কুলটার কথা ভাবে। আর আমার কাজ কী বল? আমি যদি ইস্কুলটা না দেখি তো সব গোলমাল করে ফেলবে ছেলেমানুষের দল—

রানী বলতো—ওমা, বাবা বুঝি ছেলেমানুষ? বাবা তো বুড়ো—তুমি যে কী বলো তার ঠিক নেই—

গৌর ভট্টাচার্যি রানীর চুলগুলো নিয়ে আদর করতে করতে বলতেন—হ্যাঁ রে, আমার কাছে ওরা সবাই ছেলেমানুষ। ওই নরেন, নিমাই, ভব—আমি ওদের জন্মাতে দেখেছি তা জানিস—আমি যে আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো রে—

রানীও বলতো—তা বাবা যদি ছেলেমানুষ তাহলে আমি কী?

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—তুমি আমার মা, মা-জননী—

রানী বলতো—দূর, তোমার মা হতে আমার বয়ে গেছে! আমি তোমার মা হবো না, দিনরাত তুমি ইস্কুল নিয়ে পড়ে থাকবে, আমার দিকে মোটে দেখবে না, আমি তোমার মা হবো কেন? তুমি দিদিমাকেই দেখ না বলে—

পাশে বসে এক-একদিন দিদিমা সেলাই করতো।

বলতো—ওমা, তুই এতও লক্ষ্য করিস? তোর তো খুব বুদ্ধি—

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—বড় হলে ওর খুব-বুদ্ধি হবে দেখছি—

রানী বলতো—বাঃ, এখন কি আমি বোকা নাকি? এখনই তো আমার খুব বুদ্ধি, খুব বুদ্ধি না হলে আমি কী করে ফার্স্ট হই ইস্কুলে?

এমন সময়ে এক-একদিন বাসন্তী এসে ঢুকে পড়তো।

কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যেত। বলতো—ওমা, এখানে বসে বসে

মেয়ের গল্প হচ্ছে, আর আমি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি মেয়েকে।

শিবানী বলতো—তুমি তো জানো বৌমা, ও এখানে আসে, তবে আর ভাবো কেন?

বাসন্তী বলতো—তা আসুক খুড়ীমা, কিন্তু আমাকে বলে তো আসবে। এত ধাড়ি মেয়ে হলো, এখন কি সব সময় বাড়ির বাইরে থাকা ভালো? উনি যে রাগ করেন—আমার ওপর বকাবকি করেন—

শিবানী বলতো—তুমি বাপু বারণ করে দিও নরেনকে, ওকে যেন না বকে—

রানী বলতো—জানো দিদিমা, মা আমাকে সব সময় ধাড়ি বলে।

বাসন্তী বলতো—তা ধাড়ি মেয়েকে ধাড়ি বলবো না তো কি কচি খুকী বলবো?

রানী বলতো—তা আমি যদি ধাড়ি মেয়ে তো আমাকে শাড়ি কিনে দাও না কেন তুমি?

শিবানী শুনে হাসতো—বলতো—বেশ বলেছিস রানী, এবার তুমি ওর কথার জবাব দাও বৌমা?

বাসন্তী বলতো—কেবল পাকা-পাকা কথা বলতেই শিখেছে, একটা কোনও কাজের নাম নেই, শুধু পাকা-পাকা কথা—চল, বিকেল হলো, বাড়ি চল—

রানী দিদিমাকে জাপটে ধরতো। বলতো—আমি এখন বাড়ি যাবো না—

শিবানী বলতো—থাক না বৌমা, ও এখানে থাক—তুমি অত তাড়া দিচ্ছ কেন?

বাসন্তী বলতো—তা এখানেই সমস্ত দিন বসে বসে আপনাদের বিরক্ত করবে কেন? আপনাদের তো কোন কাজ করতে দেবে না সারাদিন—

শিবানী বলতো—কী যে বলো তুমি বৌমা, ও আসে বলে তবু তো দুটো কথা বলে সুখ পাই আমি।

বাসন্তী হাসতো। বলতো—ওঃ, খুড়ীমা ভারি একটা কথা বলবার লোক পেয়েছে—

শিবানী বলতো—না বৌমা, তুমি জানো না, ও আসে তাই তবু দুটো কথা শুনতে পাই। তোমার খুড়োমশাই তো সারাদিন ইস্কুল-ইস্কুল করেই মেতে আছেন। ছুটির দিনও নেই, কাজের দিনও নেই। ওই রানী আসে, আমি চাল-ডাল বাছি আর ওর কথা শুনি। ও না থাকলে আমি কী নিয়ে থাকতাম বলো তো?

রানী বলতো—মাকে বলো আমি তোমার কত কাজ করে দিই না?

বাসন্তী বলতো—ওঃ, একেবারে খুব কম্মের মেয়ে হয়েছে দেখছি—

শিবানী বলতো—না বৌমা, ও তোমার খুব কাজের মেয়ে; ও আমার কত চাল-ডাল বেছে দেয়। ও আমার বড়ি দিয়ে দেয়—

—ওমা, তাই নাকি? ও বড়ি দিতে পারে নাকি?

শিবানী বলতো—হ্যাঁ বৌমা, তুমি বিশ্বাস করবে না, কী চমৎকার বড়ি দিতে পারে ও, আমি তো দেখে অবাক। নাকগুলো কী চমৎকার ছুঁচলো হয়! ও আমার আরো কত কাজ করে জানো। আমার তো চোখ নেই, ও ছুঁচে সুতো পরিয়ে দেয়···

রানী হঠাৎ বলে উঠতো—আমি ভাতও রাঁধতে পারি, না দিদিমা?

এ-সব বহুদিন আগের কথা। বহুদিন আগে থেকেই রানী যেন এ-বাড়ির মেয়ে হয়ে গিয়েছিল।

বাসন্তী ডাকতে এসে আবার ফিরে যেত।

বলতো—তবে থাক ও তোমার কাছে খুড়ীমা, আমি চলি—

শিবানী বলতো—তুমি কিছুছু ভেবো না বৌমা, আমি ওকে খাইয়ে-দাইয়ে তোমার কাছে শম্ভুর মা'কে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো, আর নয় তো তোমার খুড়োমশাই-ই ওকে দিয়ে আসবেন—

বাসন্তী তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যেত।

কিন্তু তারপর কত কী কাণ্ড হয়ে গেল। দিলদারপুরে মেয়েটা মারা গেল। ফটিক এল বলরামপুরে। এসে স্কুলে ভর্তি হলো। রানীও ততদিনে বড় হলো। সেই যে ইস্কুল নিয়ে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর অত মাথাব্যথা, সেই স্কুলও কত বড় হয়ে গেল। একদিন সংস্কৃত কম্‌পালসারি থেকে অপ্‌শোন্যালে নেমে এল। অত যে স্কুল বসবার সময় সংস্কৃত স্তোত্র পড়বার নিয়ম করে দিয়েছিলেন, তাও একদিন বন্ধ হয়ে গেল। কেন? না, এ ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ, এখানে কার ধর্মবোধে কখন আঘাত লাগে কে জানে!

সেদিন নিজের ঘরখানার মধ্যে একমনে গৌর ভট্টাচার্যি খাতাপত্র দেখছিলেন।

হঠাৎ যেন কে বাইরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

—প্রণাম পণ্ডিত মশাই।

অচেনা লোক। পণ্ডিত মশাই বললেন—কে তুমি? কী চাও?

—আজ্ঞে, আপনার কাছে একটা আর্জি ছিল।

—কীসের আর্জি?

—আমার একটা আড়াই শো টাকার বিলের টাকা বাকি পড়েছে।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—বিলের টাকা বাকি পড়েছে তো আমাকে কেন? আমি কি টাকা দেবার মালিক? তুমি আমাদের ক্যাশিয়ার হরলালের কাছে যাও। কিংবা হেডমাস্টার ভবরঞ্জন আছে, তার কাছে যাও—

লোকটা বললে—আজ্ঞে গিয়েছিলাম, দু'জনের কাছেই গিয়েছিলাম।

—তা ওরা কী বলে ?

—বলে টাকা নেই।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—টাকা নেই ? আড়াই শো টাকা নেই ? তা হয়তো টাকা নেই, তুমি একটু দিনকতক সবুর করো, সব সময় কি হাতের কাছে টাকা থাকে ? দিনকতক পরে এসো।

—আজ্ঞে, এক বছর হতে চললো, অনেকদিন ধরে টাকাটা আটকে আছে…

—এক বছর ? বলো কী ? আড়াই শো টাকার জন্যে তোমাকে এক বছর ধরে ঘোরাচ্ছে ?

বলে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন—চলো তো, আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে হরলালের কাছে নিয়ে যাচ্ছি—

হরলাল দোতলায় বসে। হেডমাস্টারের পাশের ঘর। কাজ করতে করতে বাঁ হাতে বিড়ি খাচ্ছিল। গৌর ভট্টাচার্যি মশাইকে দেখেই বিড়িটা তাড়াতাড়ি পায়ের জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিলে।

—হরলাল, একে তুমি টাকা দিচ্ছ না কেন ? আড়াই শো টাকার বিল নিয়ে আজ এ এক বচ্ছর হাঁটাহাঁটি করছে ? একে বিলটা মিটিয়ে দিলেই হয়।

বলে লোকটার হাত থেকে বিলটা নিয়ে এগিয়ে দিলেন। কী একটা ট্রেডিং কোম্পানীর বিল। তারা ল্যাবরেটরির জন্যে নাকি কবে একটা অ্যাপারেটাস সাপ্লাই করেছিল।

হরলাল দেখে বললে—কিন্তু এ বিল নিয়ে আপনার কাছে গেছে কেন ? আমি তো ওকে বলেছি দু'একমাস পরে আসতে। ক্যাশে এখন অত টাকা নেই।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—আড়াই শো টাকাও নেই ?

—আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, অন্য অনেকগুলো মোটা পেমেণ্ট করতে হলো কিনা, তাই একটু মুশকিল হয়েছে।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই আর সামলাতে পারলেন না। বললেন —আজকাল তোমাদের কী হয়েছে বলো দিকিনি, আড়াই শো টাকার বিল তোমরা এক বছর ধরে আটকে রেখেছ? আমার আমলে তো এমন কখনো হয়নি!

বলে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে ভবরঞ্জনের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। হরলালও সঙ্গে চললো।

—এটা তোমাদের কী রকম আক্কেল ভব? এই দেখ, তোমাদের এই আড়াই শো টাকার বিল আজ এক বচ্ছর ধরে পেমেণ্টই হচ্ছে না। লোকটাকে হরলাল মাসের পর মাস কেবল ঘোরাচ্ছে, এ তোমাদের কীরকম ব্যবস্থা ভব? আজকাল তোমাদের এ কী রকম হাল হয়েছে? কই, আমার সময়ে তো এমন ছিল না?

ভবরঞ্জন বিলটা দেখে বললে—হ্যাঁ, আমার কাছেও এসেছিল। কিন্তু একটু মুশকিল হয়েছে মাস্টারমশাই, এখন হরলালের কাছে টাকার একটু টানাটানি চলেছে—

—টানাটানি চলা তো ভালো কথা নয়। এই সেদিন শিবেন্দু বলছিল ওর সেকশানে কী একটা যন্ত্র দরকার, সেটাও নাকি তোমরা কিনছো না। এ-রকম করলে ছেলেদের লেখাপড়া হবে কী করে? তোমরা কি ইস্কুলটাকে বন্ধ করে দিতে চাও সবাই মিলে? এ-রকম করলে ইস্কুল টিকবে?

তারপর বললেন—তা এখন এর কী করবে বলো!

ভবরঞ্জন লোকটার দিকে চেয়ে বললে—তুমি আসছে মাসের মাঝামাঝি একবার আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেবো—তুমি কিছু ভেবো না—

লোকটা বিলটা নিয়ে নমস্কার করে চলে গেল।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—এ তোমাদের বড় অন্যায় ভব। আমি বুঝতে পারি না এত টাকা তোমাদের কোথায় যায়! সামান্য আড়াই শো টাকার জন্যে লোকটাকে এক বছর ধরে ঘোরাচ্ছো, এতে ইস্কুলের বদনাম হচ্ছে না? কই, আমার সময়ে তো কখনও এমন ঘটনা

ঘটেনি। মথুর সা' মশাই এ-সব জিনিস বড় অপছন্দ করতেন। বলতেন—যার যা প্রাপ্য টাকা তা ঠিক সময়ে দিতে হয়, তাতে কাজ ভাল হয়।

ভবরঞ্জন বললে—আপনি তো জানেন মাস্টারমশাই, এখন টাকার বড় টানাটানি চলছে, টীচারদের মাইনে বাড়ানো যাচ্ছে না, ছাত্রদেরও মাইনে বাড়াতে পারা যাচ্ছে না—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তা কিছুই যদি করতে পারবে না তোমরা তো কমিটি রয়েছে কী করতে? কমিটি কি শুধু খাবার জন্যে রয়েছে? কমিটির মিটিং-এর দিনে কত টাকার রাজভোগ-সিঙাড়া খরচ হয় বলো তো? তার বেলায় তো তোমাদের টাকার টানাটানি হয় না? তা এই রকমই যদি করবে তো ইস্কুল না করে লোহা-লক্কড়ের কারবার করলেই হতো, সরষের তেল কিংবা মনিহারির দোকান করলেও বেশি লাভ হতো। সে-সব না করে আমি ইস্কুল করলুম কেন, বলো?

বলে আর দাঁড়ালেন না সেখানে। গট গট করতে করতে বাইরে চলে এলেন।

হরলাল তখনও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই চলে যাবার পর বললে—এরকম করলে তো আর কাজ চালানো যায় না হেডমাস্টার মশাই।

ভবরঞ্জন বললে—আপনি যান হরলালবাবু, আমি দেখি সেক্রেটারিকে জিনিসটা বলি গিয়ে সব—

তা কাজ কি একটা? গৌর ভট্টাচার্যি কোন্ দিক সামলাবেন! স্কুলের কোনও ব্যাপারেই তিনি নেই, অথচ সব ব্যাপারেই তার মাথা

ঘামানো যেন অনিবার্য হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

শিবানী বলতো—তুমি এ বয়সে আর ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাও কেন?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বলতেন—মাথা ঘামাবো না? আমি এত কষ্ট করে ইস্কুলটা গড়ে তুললুম আর সাত ভূতে মিলে সেটা নষ্ট করে ফেলবে?

শিবানী বলতো—তা তুমি তো আর চিরকাল থাকবে না। তখন কি আর ইস্কুল চলবে না?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বলতেন—ছাই চলবে। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, এই তোমায় বলে রাখলুম। দু'চারজন যা ভালো মাস্টার আছে, তাদের কি আর ওরা মন দিয়ে কাজ করতে দেবে ভেবেছ? বলে কিনা টাকা নেই। কিন্তু টাকা যায় কোথায়?

তারপরে যেন হাল ছেড়ে দিতেন একেবারে। বলতেন—যাক গে, আমার আর কী? আমি আর ক'দিন? আমি চলে গেলে তখন বুঝবে! সব ছারখার করে দেবে সবাই মিলে। এখনই ছারখার করে দিচ্ছে, তখন তো আরো মজা!...তা যাক গে, আমার কী? আমি তো আর চিরকাল থাকবো না—

বলেন বটে কথাগুলো, কিন্তু ইস্কুল নিয়ে মাথা না ঘামালে যেন তাঁর ভাতই হজম হয় না।

—পণ্ডিত মশাই আছেন? পণ্ডিত মশাই?

বড় রাগ হয়ে গেল গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর। নিশ্চয়ই কোনও পাবলিশার, নয় তো কোনও অভিভাবক। ছেলেকে ফ্রি করে দিতে অনুরোধ করতে এসেছে।

ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বললেন—না, বাড়িতে কারো সঙ্গে দেখা করবো না আমি। ইস্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করো গিয়ে। আমি ইস্কুলের কেউ নই।

—আজ্ঞে, এক মিনিট যদি একটু দেখা করতেন, আমার বিশেষ জরুরী দরকার ছিল—

পণ্ডিত মশাই বললেন—না, বাড়িতে হবে না, আমি কাউকে পাশ করিয়ে দিতে পারবো না—

শেষের দিকে জ্বালাতন হয়ে গিয়েছিলেন ভট্টাচার্যি মশাই। সকলের সব সুবিধে করে দাও, কারোর ছেলেকে পাশ করিয়ে দেওয়া, কারো মাইনে মাফ করানো, একটা-না-একটা অনুরোধ লেগে আছেই। কিন্তু একবার তেমন করে ধরতে পারলে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর মতন মানুষও আবার পাওয়া শক্ত।

লোকে বলে—যা-ই বলুন, আসলে আপনিই তো সব পণ্ডিত মশাই।

গৌর ভট্টাচার্যি বলতেন—আমিই সব মানে? আমি কী করে সব হলুম? হেডমাস্টার নেই ইস্কুলের? সেক্রেটারি নেই? প্রেসিডেণ্ট নেই? কমিটি নেই?

লোকে বলতো—তা থাকলেই বা, আপনি একদিন চলে গিয়ে দেখুন, কেমন করে ইস্কুল চলে—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই হেসে বলতেন—আরে, রাজা মরে গেলে রাজ্য চলে, আর আমি তো কোন্ ছার—

ফটিক এক-একদিন ক্ষেপে ওঠে। রাত্তিরে বৃষ্টি হলে সারা ঘরময় যখন জল পড়ে তখন আর তার জ্ঞান থাকে না। শিবানী বালতি ঘটি থালা গামলা পেতে পেতে দেয় জলের তলায়। সেগুলো ভর্তি হয়ে গেলে জল ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে পেতে দিতে হয়। সারাক্ষণ এই-ই করতে হয় শিবানীকে। একটা জায়গায় ছাদ ফুটো হলে তবু চলে কিন্তু এর সর্বাঙ্গে ফুটো। শিবানী ফটিককে বলে—ওরে, তোর বিছানার ওপর জল পড়ছে রে, ওখানে একটা গামলা পেতে দে বাবা—

ফটিক বলে—পারবো না আমি, ও ভিজুক—

শিবানী বলে—ভিজলে শুবি কোথায়? তোর দাতুই বা কোথায় শোবে?

ফটিক বলে—শোব না আমি, তোমাদের এই পচা বাড়িতে আমার শুতে বয়ে গেছে। একটা ভালো বাড়ি করতে পারো না তুমি? সুশীলদের কেমন নতুন বাড়ি বলো তো? ওদের বাড়িতে তো কই জল পড়ে না—ওদের কেমন নতুন বাড়ি, ওই রকম একটা বাড়ি, ওই রকম একটা বাড়ি করতে পারে না দাতু?

ততক্ষণে ভিজে জাব হয়ে গেছে বিছানা। শিবানীকে নিজেকেই তক্তপোষ ধরে টানতে হয়। বৃষ্টির জল বাঁচিয়ে এককোণের দিকে বিছানা করতে হয়। কিন্তু আবার সেখানেও জল পড়তে শুরু করে। তখন শিবানীরও রাগ ধরে যায়—

হঠাৎ বাইরে থেকে দাতুর ডাক আসে—ওরে ফটিক, দরজা খুলে দে রে—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই নিজেও তখন ভিজে গেছেন বেশ। শিবানী দরজা খুলে দিতেই গৌর ভট্টাচার্যি মশাই উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় ওঠেন। দাওয়াও তখন ভিজে একশা।

সব দেখেশুনে নিজের মনেই যেন বলেন—এঃ, এ যে একেবারে সব ভিজে গেছে গো! কোথায় শোবে তোমরা?

তাঁর কথা যেন কেউ শুনতেই পায় না। তিনি ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখেন বালতি, থালা, গামলা পাতা রয়েছে সব জায়গায়। সত্যিই তো, শোবে কোথায় ওরা।

শিবানী তখন ঘর-দোর বিছানা সাফ করছিল। আর থাকতে পারলে না।

বললে—আমাদের কথা তোমার ভাবতে হবে না, তুমি তোমার ইস্কুলের কথা ভাবো গে, তাহলেই ইস্টলাভ হবে! আমাদের কথা তুমি কখনও ভেবেছ যে, আজ ভাবতে বসেছ?

ফটিকও রেগে ছিল অনেকক্ষণ ধরে। বললে—তুমি একটা নতুন

বাড়ি করতে পারো না? সবাইদের কেমন নতুন বাড়ি। কারোদের বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ে না—

বাড়ি! ছেলেমানুষ, জানে না যে বাড়ি করার কত খরচ!

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই হাসলেন। বললেন—ওরে, বাড়ি করা কি অত সহজ রে—

ফটিক বললে—তা ছাদ তো সারাবে?

শিবানী সে-কথারই জের টেনে বললে—তা ফটিক অন্যায়টা কী বলেছে? নতুন বাড়ি কে করেনি? তোমার ভব সেদিনকার ছেলে, সে নতুন বাড়ি করলে না? তোমার ইস্কুলের সব মাস্টার তো বাড়ি করেছে। শশধরবাবু বাড়ি করেনি?

গৌর ভট্টাচার্যি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। বলেন—ওদের কথা বলছো কেন? ওরা নোটবই লেখে, ওরা কোচিং ইস্কুল করে—

—তা তোমাকে নোটবই না-লিখতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে? কোচিন্ করতে কে তোমায় বারণ করেছে শুনি? তুমি কী একেবারে মহাপীর হয়েছ যে, নোটবই লিখলে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? ছেলে পড়িয়ে টাকা নেবে না। কত লোক তোমাকে ছেলে পড়ানোর জন্যে সাধাসাধি করেছে। তা কই, তখন তুমি একবার বাড়ির কথা ভেবেছ? অতই যদি মহাপীর হয়েছ তো বিয়ে করতে গেলে কোন্ মুখে? সংসারই বা করতে তোমায় কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

কথা একবার বলতে আরম্ভ করলে সে-কথার আর শেষ হয় না। অনেক রাত্রে কখন বৃষ্টি থেমে গেছে, জল পড়াও থেমেছে, তিনি নিজের ন্যাড়া তক্তপোষটার ওপর বসে বসে খাতা দেখছিলেন। কিন্তু বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলেন। কেবল শিবানীর কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছিল—কে তাঁকে নোটবই লিখতে বারণ করেছে। কে মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁকে বলেছে, পড়িয়ে টাকা নিতে পারবে না?

কিন্তু সে খানিকক্ষণের জন্যে। একটুখানি মনটা দুলে ওঠে শুধু। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যায়। আবার তিনি খাতা দেখতে বসেন। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। পাশের পুকুর থেকে ব্যাঙ ডাকছে। একটা যেন—থমথমে ভাব বিরাজ করছে চারদিকে। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই শেষ খাতাটা দেখে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিলেন। তারপর সেই শক্ত পাথরের মত তক্তপোষটার ওপরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সেদিন ছাত্রদের মাইনে বাড়বার সারকুলারটা বেরোল। পণ্ডিত মশাই-এর হাতে এল সারকুলারটা। জনার্দনের কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিলেন। বললেন—দেখি রে, কী ওটা?

জনার্দন বললে—আজ্ঞে, ছেলেদের মাইনে বাড়ছে—

গৌর ভট্টাচার্যি সবটা পড়লেন, তারপর সেটা নিঃশব্দে ফেরত দিয়ে দিলেন জনার্দনের হাতে। মুখে কিছু বললেন না। তারপর আবার নিজের কাজ করতে লাগলেন। চুলোয় যাক সব, যা ইচ্ছে করুক গে ওরা। আমার কী? ইস্কুলটাই নষ্ট হবে। ছেলেদেরই ক্ষতি হবে।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতেও পারলেন না। ছটফট করতে লাগলেন। ঘরের বাইরে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। সমস্ত ইস্কুল-বাড়িটায় ছেলেদের ক্লাশ চলছে। সবাই পড়ছে মন দিয়ে। কিংবা হয়তো মন দিয়ে পড়ছে না। তাঁরই ভয়ে হয়তো সবাই চুপ করে আছে। কিংবা হয়তো তারা গোলমালই করছে। তাঁর কানেই গোলমাল ঢুকছে না।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন।

বললেন—প্রণাম হই পণ্ডিত মশাই—

—কী চাই? আমার কাছে কেন এসেছেন? আমি এ-স্কুলের কেউ না, আপনি হেডমাস্টারের কাছে যান, যা দরকার তাকে বলুন গিয়ে।

ভদ্রলোক বললেন—না, আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি—

—কী দরকার?

—আজ্ঞে, আমি এসেছি একটি সম্বন্ধ নিয়ে।

—কিসের সম্বন্ধ?

—বিবাহের।

—বিবাহ? বিয়ে? বিয়ের কথা শুনে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই অবাক হয়ে গেলেন।

—হাঁসখালির জমিদারবাবু রতননারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান—তারই বিবাহের ব্যাপারে একটি পাত্রীর সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছি। আমি ঘটক।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তা পাত্রী কে? আমার তো কোনও আত্মীয়স্বজনের মেয়ে নেই।

—না, এই স্কুলের সেক্রেটারি নরেন চক্রবর্তী মশাই-এর একটি মেয়ে আছে, তার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তা সে-সব ব্যাপার বলতে ইস্কুলে কেন?

ঘটক বললে—আজ্ঞে, আমি আপনার বাড়ি গিয়েছিলুম, তা আপনি বাড়ির ভেতর থেকে বললেন ইস্কুলে আসতে, তাই ইস্কুলে এসেছি।

—কিন্তু যার মেয়ে তার কাছে তো যাবেন! আমি কে? রানী তো আমার মেয়ে নয়। নরেনের বাড়ি যান, তার কাছে কথা পাড়ুন—

ঘটক বললে—কিন্তু আমি শুনেছি সে আপনার নিজের মেয়ের

মতই, আপনার বাড়িতেই সে বেশিক্ষণ থাকে। আপনি মত দিলে নরেনবাবু অমত করবেন না।

—না না, কে বললে? গৌর ভট্টাচার্যি আপত্তি করে উঠলেন—আমার কথা নরেন শুনবে কেন? আমি কে? নরেনও আমার কেউ নয়, আমিও নরেনের কেউ নই! আপনি ভুল শুনেছেন—

ঘটক বোধ হয় এ-লাইনে পাকা লোক।

বললে—আজ্ঞে, এ সম্বন্ধটার ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। আপনি দয়া করে একবারটি পাত্র দেখে আসবেন চলুন—আমি আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবো, আপনার কোন কষ্ট হবে না—

—তা আগে নরেনের মত তো নিতে হবে! তার মেয়ে, তার মত আগে নিতে হবে না?

ঘটক বললে—আপনি আগে নিজেই দেখুন না, তারপরে নরেনবাবুর মত নিলেই চলবে—

বলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে বললে—রতননারায়ণ চৌধুরী হাঁস-খালির জমিদার, বুঝতেই তো পারছেন। ষোল লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক। আগে আরো সম্পত্তি ছিল, এখন তবু তেমন জলুস নেই। কিন্তু নেই-নেই করেও যা আছে, তাও অনেক। তাঁরই একমাত্র সন্তান। সুতরাং পাওনা-থোওনার দিক থেকে এমন কুটুম আর হবে না—। একটি পয়সা চায় না পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে। আর মেয়েও আপনার পরম সুখে থাকবে। ছেলেটারও সৎ চরিত্র—

—আর মেয়ে? মেয়ে আগে দেখবেন না তাঁরা?

—মেয়ে দেখা আছে।

—মেয়ে কী করে দেখা হলো? কবে দেখলেন?

ঘটক বললে—মেয়ে তো ইস্কুলে যায়। তাঁরা দূর থেকে মেয়ে দেখে নিয়েছেন—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই একটু ভাবলেন এক মুহূর্ত। অবন্তীর

বিয়ের কথাটা মনে পড়ল একবার। সেবার ভালো করে পাত্রও দেখা হয়নি। অবন্তীর কথা মনে পড়তেই জিজ্ঞেস করলেন—পাত্র লেখা-পড়া কত দূর করেছে?

—আজ্ঞে, বি-এ পাশ। কিন্তু চাকরি তো করতে হবে না কোনোদিন। তাই আর এম-এটা পড়েনি।

—আর স্বাস্থ্য?

—স্বাস্থ্য আপনি নিজের চোখেই দেখবেন। ও আর আমি নিজের মুখে কী বলবো? রতনবাবুর ভারি ইচ্ছে এই মেয়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করেন। তাহলে কবে যাবেন বলুন?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—আমার তো রবিবার ছাড়া সময় নেই—

—তা সেই কথাই রইল। বলে ঘটকমশাই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলে।

যাবার সময় বললে—আমি তাহলে রবিবার সকালেই আসবো আপনার বাড়িতে। এসে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো—

রবিবার সন্ধ্যেবেলা শিবানী বাড়িতে অপেক্ষা করছিল। কর্তা বাড়িতে নেই, ফটিকও বেরিয়ে গিয়েছে। বীরগঞ্জের থিয়েটারের ক্লাবে তখন রীতিমত গানবাজনা চলছে।

সুশীল এক ফাঁকে বললে—হ্যাঁ রে, বাড়ি যাবি না?

ফটিক হারমোনিয়ামটা নিয়ে টিপছে আর গান গাইছে—

বীরগঞ্জের এ-ক্লাবের নাম-ডাক আছে বহুদিনের। দু'একদিন ঘুরতে ঘুরতে ফটিক একদিন সুশীলকে নিয়ে এখানে ঢুকে পড়েছিল। সেই থেকেই আলাপ শুরু। তারপরে একদিন ফটিকের গান শুনে

ক্লাবের সেক্রেটারি বলেছিল—বেড়ে গলা তো তোমার হে ছোকরা, আমাদের থিয়েটারে পার্ট করবে তুমি?

এ যেন সেই—পাগলা খাবি, না আঁচাবো কোথায়?

ফটিক বললে—দিলদারপুরে আমি আমার বাবার থিয়েটার দেখেছি—

তারপর সুশীলকে দেখিয়ে বললে—আমার এই বন্ধুও থিয়েটার করবে আমার সঙ্গে—

সুশীল তো ভয়ে অস্থির। বললে—না ভাই, আমি পারবো না—

ফটিক বললে—তোর ভয় কী? আমি তো আছি, আমি তোকে শিখিয়ে দেবো—

সুশীল বললে—কিন্তু ভাই, যদি বাবা জানতে পারে?

ফটিক বললে—চিনতে পারবে কী করে রে? গোঁফ-দাড়ি-ড্রেস পরে মেকআপ্ করলে আর কারো বাবার সাধ্যি নেই চেনে। তুই কিছ্ছু ভাবিসনি—

কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ জমে উঠেছিল রিহার্সল। রোজ যেতে হয় না ফটিকদের। সামনে একজামিন আসছে। তার ভাবনাও আছে। কিন্তু ফটিক বলতো—হপ্তায় তো ছ'তিন দিন রে, কে আর জানতে পারছে?

ইস্কুলের যেই ছুটি হতো আর দু'জনে বেরিয়ে পড়তো বীরগঞ্জের দিকে। তারপর ক্লাবে বসে গান-বাজনা চলতো সন্ধ্যে পর্যন্ত। তখন বোধ হয় টনক নড়তো সুশীলের।

সুশীল বলতো—চল্ ভাই, বাড়ি চল্, মাস্টারমশাই আসবে—

ফটিক বলতো—দুর, তুই একটা আস্ত বেরসিক, দেখছিস গান হচ্ছে, মাঝখানে উঠে যাওয়া যায়?

বাড়িতে এলে শিবানী জিজ্ঞেস করতো—কী রে, এত দেরি হলো যে তোর? কোথায় গিয়েছিলি?

ফটিক বলতো—পড়তে—

—পড়তে মানে? কার কাছে পড়িস?

ফটিক বলতো—একজন মাস্টারের কাছে।

শিবানী বলতো—কোন্ মাস্টার? মাইনে নেয় না পড়াতে?

ফটিক বলতো—তুমি সব কথায় ফ্যাচফ্যাচ করো কেন বলো তো? তুমি মেয়েমানুষ, বাড়িতে বসে থাকো না, তুমি লেখাপড়ার কী জানো?

—তা তোর দাদু জানে?

ফটিক বলতো—দাদু কেন জানবে? দাদুর কাছে যেন আবার চুকলি খেও না তুমি আমার নামে। তোমার তো কেবল চুকলি খাওয়া স্বভাব! রেজাল্ট দেখিয়ে তখন একেবারে দাদুকে চমকিয়ে দিয়ে ছাড়বো—

এর পর আর শিবানী কিছু বলতো না। গৌর ভট্টাচার্যি অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরে দেখতেন ফটিক মাদুর পেতে এক মনে দুলে দুলে পড়ছে। দেখে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই খুশী হতেন।

বলতেন—বেশ মন দিয়ে পড়বে বাবা। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ, বুঝলে তো? ছাত্রাবস্থায় পড়াই হচ্ছে জপ-তপ-ধ্যান—

তা সেদিনও তাই। ফটিক দাদুর বাড়ি ফিরবার সময়টা আন্দাজ করেই পড়তে বসেছে। কিন্তু তখনও থিয়েটারের গানটা তার কানের কাছে যেন বাজছে।—

তোমার সনে মিলন এবার
স্মৃতির বকুল তলে।
নয়ন জলে গেঁথে মালা
দিব তোমার গলে॥
তোমার পূজায় বিভোর রবো,
ঢালবো ব্যথা চরণমূলে।
তোমার ছবি রাখবো এঁকে
আমারই এ মন-দেউলে॥

ক্লাবের মাস্টার ফটিককে বলে দিয়েছে ডি-সার্পে গাইতে।

ক্লাব থেকে সারা রাস্তা গানটা গুন গুন করে গেয়ে বাড়ি এসেছে। কিন্তু তার রেশ তখনও থামেনি। পড়ার বই-এর পাতার মধ্যে মন দেবার চেষ্টা করেও যেন ভাল করে মন বসছে না। সুরটা গলা থেকে ঠেলে বেরোতে চাইছে কেবল।

হঠাৎ গৌর ভট্টাচার্যি বাড়ি ঢুকলেন। দেখলেন—ফটিক পড়ছে। মনটা খুশী হয়ে উঠলো। ছাত্রদের মাইনে বাড়ার খবরটা পাওয়ায় যেমন দমে গিয়েছিলেন, ফটিককে পড়তে দেখে তেমনি আবার ভালো লাগলো।

বললেন—বেশ মন দিয়ে পড়বে বাবা। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ, জানো তো? ছাত্রাবস্থায় পড়াই হচ্ছে জপ-তপ-ধ্যান সব-কিছু—

ভেতরের ঘরে শিবানী বসে বসে ছুঁচ সুতো দিয়ে চাদর সেলাই করছিল। সেখানেই সামনে বসে ছিল রানী।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—এত রাত পর্যন্ত রানীকে আটকে রেখেছ কেন গো? ওর পড়াশোনা নেই?

শিবানী বললে—আমি কি ওকে আটকে রেখেছি, ও নিজেই তো রয়েছে! ওর মা এসেছিল ডাকতে, গেল না।

রানী বললে—বা রে, আমি বুঝি চুপ করে বসে আছি? কাজ করছি না? আমি চলে গেলে তোমার ছুঁচে সুতো পরিয়ে দেবে কে শুনি? দিদিমা কি চোখে দেখতে পায় নাকি?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তাই নাকি, চোখে দেখতে পায় না দিদিমা?

রানী বললে—না, তুমি তো একটা চশমাও করে দেবে না দিদিমাকে, দেখতে পাবে কী করে?

শিবানী হাসতে হাসতে বললে—তোর দাদুর কথা ছাড়, দাদু কেবল ইস্কুলই জানে, কেবল ইস্কুলের ছেলেদের মারতেই জানে—আর কিছু জানে না—

রানী হাসতে হাসতে বললে—তা মারুক, ইস্কুলের ছেলেদের

মারে, বেশ করে। ইস্কুলের ছেলেরা ভারি পাজি—

হঠাৎ বাসন্তী এসে ঢুকলো।

শিবানী বললে—ওই ছাখ, তোর মা এসেছে—এবার যা—

বাসন্তী বললে—একে নিয়ে আমার জ্বালা হয়েছে খুড়ীমা, সারাক্ষণ বাইরে থাকলে আমিই বা কী করে শান্তিতে থাকি? উনি এসেই জিজ্ঞেস করলেন—কই, রানী কই—তাই আবার ডাকতে এলুম—

শিবানী বললে—এই আমার ছুঁচে সুতো পরিয়ে দিচ্ছিল বৌমা—

তারপর রানীকে বললে—যাও মা, এবার যাও, কালকে আবার এসো—

বাসন্তী চলে যাচ্ছিল রানীকে নিয়ে। ভেতর থেকে গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—এবার বৌমা, তোমার মেয়ের একটা বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি—

বাসন্তী ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—তা দিন না খুড়োমশাই, আমি তো মেয়েকে পার করতে পারলে বেঁচে যাই। ও কি আর আমার মেয়ে? আমি শুধু পেটেই ধরেছি। আসলে ও খুড়ীমারই মেয়ে—

বলে রানীকে আগলে নিয়ে বাসন্তী চলে গেল।

শিবানী বললে—তুমি রানীর বিয়ে দিচ্ছ নাকি সত্যি সত্যি?

গৌর ভট্টাচার্যি জামা খুলতে খুলতে বললেন—হ্যাঁ, আজকে এক ঘটক এসেছিল পাত্রের খবর নিয়ে। হাঁসখালির জমিদার রতন-নারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। পাত্র একাই নাকি সব সম্পত্তির মালিক।

শিবানীর বোধহয় অবন্তীর বিয়ের কথা মনে পড়ে গেল। বললে—তোমার তো পছন্দ, সে আমি জানি—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—ওগো না, এবার আর যেমন-তেমন করে পাত্র দেখবো না। আর ভুল করি? এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আসবো, পাত্রের সঙ্গে কথা বলবো। রোববার দিন ঘটক আমায় নিয়ে যেতে আসছে—

ফটিক তখনও এক মনে পড়ছে। ভেতরে এত কথাবার্তা চলছে সেদিকে তখন আর তার খেয়াল নেই।

আসলে রবিবারগুলোতেও গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর ছুটি থাকে না। কোনও-না-কোনও কাজ নিয়ে স্কুলে চলে যান। স্কুলে গিয়ে নিজের ঘরের চাবিটা নিয়ে নিজেই দরজা খোলেন। নইলে জনার্দনই এসে তাড়াতাড়ি দরজা-জানালা খুলে দেয়। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই ওখানে বসে বসে ছেলেদের হোম-টাস্কের খাতাগুলো দেখেন। তাছাড়া ইস্কুলের অন্য সব কাজকর্মও দেখেন। কাজ তো কম নয়। অত বড় বাগান, অতগুলো বাড়ি। কোন্ কোণে ময়লা জমে আছে, কোথায় ইঁটের দেয়ালে অশথগাছ গজিয়েছে।···

খানিক পরে জনার্দনও এসে সামনে মেজের ওপর বসে। বসে বসে গল্প করে। ইস্কুলের কথা বলে। মাস্টার মশাইদের কথা যা জানে যা শোনে তা বলে। অন্যদিন কাজের ঝামেলার মধ্যে সব শোনানো সম্ভব হয় না।

তাই একটু নিরিবিলি পেলে বলে—মাস্টার মশাইরা খুব খুশী হয়েছে, জানেন পণ্ডিত মশাই!

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—কেন রে?

—ওই যে সব্বার মাইনে বেড়ে গেছে। কিন্তু সব্বাই রাগ করেছে আপনার ওপর, জানেন? বলছিল—পণ্ডিত মশাই-এর জন্যেই এতদিন আমাদের মাইনে বাড়ছিল না—

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—তা তো বলবেই। নিজেদের মাইনে বাড়লে কার না আনন্দ হয়। কিন্তু আমি কি তার জন্যে কিছু বলেছি? দিন-কাল যে-রকম তাতে ছেলেদের বাপ-মা'র কী কষ্ট বল

দিকিনি তুই? এদের যেমন আনন্দ, তাদের তো আবার তেমনি কষ্ট। এই আকালের দিনে ছেলেদের মাইনে না বাড়ালেই কি চলতো না, তুই-ই বল্—

কিন্তু এ-সব গল্প সে-রবিবারটাতে করা হলো না। হাঁসখালির জমিদার বাড়ি থেকে তখন ফিরছিলেন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই। বেলা পড়ে আসছে। বড় জমিদারই ছিলেন বটে এককালে হাঁসখালির চৌধুরীরা। বিরাট চকমিলান সেকালের ধাঁচের বাড়ি। কোন্ পূর্বপুরুষের আমলে তাঁদের হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল। বিরাট বাড়ির মধ্যে হাতি ঢুকতে পারে, সেই রকম মাপের পেতলের গুল-আঁটা দরজা। রতনবাবু ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেইসব আমলের ঐশ্বর্য দেখালেন। পাত্রও এল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। এসে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

পণ্ডিত মশাই সব দেখলেন। গোটা কয়েক প্রশ্নও করলেন।

রতনবাবু বললেন—আমার ওই এক পুত্র। সন্তান বলতেও ওই এক। আমার ইচ্ছে, নরেনবাবুর কন্যাটিকেই আমি বধূ করে ঘরে আনি—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই মুখে কিছু বললেন না। শুধু সব দেখতে লাগলেন মন দিয়ে। কিন্তু ভালো লাগলো না। এই চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী তাঁর চোখে যেন বড় কটু ঠেকলো। ঘরের আসবাব-পত্রের কমতি নেই, কিন্তু কোথাও একটা বই-এর চিহ্ন পর্যন্ত দেখলেন না। একটা বই-ভর্তি আলমারিও নেই ঘরের ভেতর।

আসবার সময় পথে এইসব কথাগুলোই ভাবছিলেন। নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে এত সব কিছু দেখেননি বলে এখন আফশোশ হচ্ছে। কিন্তু এবার আর সে ভুল করবেন না।

হঠাৎ কেদারের সঙ্গে দেখা।

কেদার আর তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। কেদারের কাঁধে মাছ ধরার জাল।

বললে—পেন্নাম হই পণ্ডিত মশাই—কোথায় গিছ্লেন?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—হাঁসখালি থেকে আসছি। তুমি কোত্থেকে ?

কেদার বললে—এই বীরগঞ্জে একটা পুকুরে জাল ফেলতে গিয়েছিলাম—

পণ্ডিত মশাই বললেন—মাছ পেলে কেমন ?

কেদার বললে—তেমন জুতসই হলো না পণ্ডিত মশাই, আধমণটাক চারা পোনা উঠলো। কিন্তু আজ সকালে আপনার ইস্কুলের পুকুরে জাল ফেলে খুব মজুরি পুষিয়ে গিয়েছে, প্রায় সাতশো টাকার মতন মাছ পেইচি—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই চমকে গেলেন—ইস্কুলের পুকুর ? আমাদের ইস্কুলের পুকুর ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ পণ্ডিত মশাই, খুব বড় বড় মাছ হয়েছিল। এক-একটা মাছ দশ সের বারো সের পর্যন্ত ছিল, খুব লাভ করেছি—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—কিন্তু তোমাকে কে মাছ ধরবার বরাত দিলে ?

—কেন, সা' মশাই নিজে আমাকে ডেকে খবর দিয়েছিলেন।

তা হবে। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বললেন—কত টাকার মত বললে ?

কেদার বললে—আমি তো সাতশো টাকায় কিনলাম সব মাছ। সা' মশাই-এর বাড়িতে একটা বারো সেরি মাছ তুলে দিয়ে এলাম আসবার সময়—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—ভালো করেছ—

মনে মনে বললেন, সত্যিই ভালো করেছে কেদার। যাবার সময় কেদার বললে—ইস্কুলের পুকুরটা খুব ভালো আজ্ঞে। বরাবর মাছ ভালো ওঠে। এর আগের বারে পাঁচশো টাকায় কিনেছিলাম, এবার সাতশো। ইস্কুলের ছেলেরা গোলমাল করে বলে মাছের বাড় ভালো হয়—

আর দাঁড়ালেন না পণ্ডিত মশাই। সেই খেয়েদেয়ে উঠেই

হাঁসখালিতে ছুটেছিলেন, আর এখন বিকেল। খুব পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন। বাড়িতে আসতেই শিবানী জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলে পাত্র?

গৌর পণ্ডিত বললেন—তত ভাল নয়, আমার পছন্দ হলো না—

—কেন?

পণ্ডিত মশাই বললেন—আরে, বড্ড বড়লোক ওরা।

শিবানী বললে—তা বড়লোক হলে তো ভালোই। রানী খুব আরামে থাকবে। আমার মত হাঁড়ি ঠেলতে হবে না গতর খাটিয়ে। ঝি-চাকর-ঠাকুরদের হুকুম করবে—

পণ্ডিত মশাই বললেন—তুমি তো ভালো বললে। কিন্তু রানীর মত মেয়ে কি ওখানে খুশী হবে? বাড়িতে হাতিশাল ছিল এককালে, ঘোড়া ছিল, গাড়ি ছিল, সেইসব কথাই সাত-কাহন করে বললেন কর্তা। কিন্তু জানো, বৈঠকখানায় একখানা বই-এর নাম-গন্ধ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। লেখাপড়ার রেওয়াজ নেই তেমন মনে হলো। রানী ওখানে থাকতে পারবে কী করে?

শিবানী বললে—তোমার ওই এক কথা! লেখাপড়া শিখে কী মাথামুণ্ডু হবে? মেয়েমানুষের অত লেখাপড়ার দরকারটা কীসের? ও তো আর চাকরি করতে যাচ্ছে না?

পরের দিন গৌর ভট্টাচার্যি খেয়েদেয়ে ইস্কুলে চলে গেছেন। তখন বাসন্তী এল।

বললে—খুড়ীমা, কালকে খুড়োমশাই হাঁসখালি গিয়েছিলেন? কী দেখে এলেন?

শিবানী বললে—ওঁর তো পাত্তোর পক্ষকে পছন্দ হয়নি বৌমা—

—কেন খুড়ীমা? পাত্র খারাপ দেখতে?

শিবানী বললে—না বৌমা, তাহলে তো তবু কথা ছিল! মস্ত বড় বাড়ি, ছেলের বাপের টাকাও আছে খুব। লাখ-লাখ টাকার নাকি মালিক। কিন্তু বললেন—লেখাপড়ার রেওয়াজ নাকি নেই বাড়িতে। একটা বই-এর আলমারিও নেই বৈঠকখানা ঘরে—

বাসন্তী বললে—তা বই না থাকলে ক্ষতি কী ?

শিবানী বললে—ওই বলে কে ? তোমার খুড়োমশাইকে তো তুমি চেনো ? উনি কি কারোর কথা শুনবেন ? চিরকাল নিজে যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। কারোর কথা তো শুনবেন না—

—তাহলে কর্তাকে কী বলবো আমি ?

—ওই কথাই বলবে। বলবে খুড়োমশাই-এর আপত্তি !

বাসন্তী খবরটা শুনে নিয়ে চলে গেল। বললে—দেখি, আমি গিয়ে তাই বলি গে।

শিবানী বললে—আর তাছাড়া এখন তো তাড়াহুড়োরও কিছু নেই। মেয়ে এখন পড়ছে, পাশ না দিলে তো তার বিয়ে দেবো না আমরা, তা সে যতই ভাল পাত্তোর আসুক—

—তা তো বটেই। আর তাছাড়া রানী তো তোমাদেরই মেয়ে খুড়ীমা। আমি পেটে ধরেছি বই তো নয়। ও খুড়োমশাই যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন—

তা সেদিন হঠাৎ সেই লোকটা আবার এল। সেই যার বিলের টাকা বাকি পড়েছিল।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই তাকে দেখে অবাক হয়ে গেছেন।

বললেন—আরে ? তোমার বিলের টাকা এখনও পাওনি ?

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে বললে—না—

—না কেন ?

লোকটা বললে—হরলালবাবু বললেন, আরো দিন কতক পরে আসতে। এখন টাকা নেই।

—সে কী, আড়াই-শো টাকাও নেই ?

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না গৌর ভট্টাচার্যি মশাই। কাজকর্ম যেমন ছিল তেমনিই পড়ে রইল।

তিনি উঠে একেবারে সোজা অফিসে চলে গেলেন। হরলাল তখন এক মনে কাজ করছে। পণ্ডিত মশাইকে দেখেই মুখের বিড়িটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—এর সেই টাকা ক'টা দেওয়া হয়নি কেন হরলাল?

—কীসের টাকা?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই তখন রেগেই গিয়েছিলেন। বললেন—আড়াই-শো টাকার যন্ত্রপাতি দিয়েছিল আমাদের ল্যাবরেটারিতে? কবে দেবার কথা ছিল, এখনও দিচ্ছ না কেন? সব ব্যাপারে কি আমাকে মাথা ঘামাতে হবে? আমি তো এখন ইস্কুলের কিছুই না। তবু সবাই আমাকেই বা সব ব্যাপারে বলতে আসে কেন?

হরলাল লোকটাকে এক পলক দেখে নিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

বললে—কিন্তু আমি তো ওকে বলে দিয়েছি দিনকতক পরে আসতে। তা ও আবার আপনার কাছে গেল কেন? আমি তো বলে দিয়েছি আমার ক্যাশে এখন টাকা নেই—

গৌর ভট্টাচার্যি বললে—টাকা নেই মানে? টাকা সব গেল কোথায়?

হরলাল বহুদিনের লোক। বহুকাল থেকে একলাই ওই হিসেব-পত্রের কাজ করে আসছে। হিসেবে তার নাম আছে ইস্কুলের মধ্যে। এ-রকম কথা অন্য কেউ বললে রেগে একশা করতো। কিন্তু গৌর ভট্টাচার্যির কথা আলাদা। তিনি এই স্কুলের জন্মদাতা। তার সামনে কড়া কথা বলা যায় না।

শুধু বললে—আজ্ঞে, আমি তো সবই ঠিক ঠিক হিসেব রাখি। টাকা না থাকলে কোত্থেকে দেবো আমি?

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই বললেন—কিন্তু এই তো গেল রবিবার

পুকুরের মাছ বেচার সাতশো টাকা জমা হয়েছে, সে টাকা এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল ?

মাছ বেচার টাকা ? কথাটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো হরলাল। মাছই বা বেচলে কে আর টাকাই বা কে দিলে! টাকা দিলে তো হরলালের খাতায় জমা পড়তো।

—তাহলে হেডমাস্টার মশাই হয়তো কিছু জানতে পারেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়।

ভবরঞ্জন এ-স্কুলের খাঁটি হেডমাস্টার। এতগুলো ছেলেকে শাসনে রাখার কাজটা সে নিখুঁতভাবে এতকাল করে আসছে। ভবরঞ্জন বললে—ও-ব্যাপার তো সা' মশাই করেছেন—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—যিনিই মাছ বেচুন, মাছ তো প্রেসিডেন্টের নয়, মাছ ইস্কুলের পুকুরের। কেদার নিজে আমাকে বলেছে, সে মাছ নিয়ে সাতশো টাকা দিয়েছে, সে টাকা তো ইস্কুলের আয়ের খাতে জমা পড়বে!

ভবরঞ্জন বললে—কিন্তু এর আগেও যখন মাছ ধরা হয়েছে তখন তো ইস্কুলের খাতে জমা পড়েনি মাস্টার মশাই!

—জমা পড়েনি মানে? আমি যখন মাছ বেচতুম, তখন তো খাতায় জমা করতুম।

ভবরঞ্জন বললে—কিন্তু আজ কয়েক বছর ধরে তো দেখে আসছি, ওটা জমা পড়ে না—

গৌর ভট্টাচার্যি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বললেন—আমি তো তাই বলছি, কেন জমা পড়ে না ?

ভবরঞ্জন যেন একটু মিইয়ে গেল। বললে—আমি ও-সব কথার কী জবাব দেবো মাস্টার মশাই। ও সেক্রেটারি আর প্রেসিডেন্ট তাঁরাই জানেন—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তুমি হলে হেডমাস্টার, তুমি যদি ও-সব না দেখো তো কে দেখবে? এই তোমরা টাকার অভাবে সায়েন্সের যন্ত্রপাতি কিনতে পারছো না, কারো পাওনা টাকা দিতে পারছো না,

আর এদিকে সাতশো টাকা ন দেবায় ন ধর্মায় বেহাত হয়ে গেল, আর তোমাদের কমিটি চুপ করে রইল? তাহলে কীসের তোমাদের কমিটি, আর কিসের তোমাদের ইস্কুল? আর তুমি হেডমাস্টার, তুমিও তো কমিটির একজন মেম্বার? তুমি চুপ করে থাকো কোন্ লজ্জায়? কীসের ভয় তোমার? চাকরি যাবার ভয়? আগে ছাত্রদের ভালোর কথা ভাববে, না, আগে তোমার নিজের চাকরির কথা ভাববে? তোমার নিজের চাকরির ভয়টাই তোমার কাছে বড় হলো? আমার কাছে এতদিন লেখাপড়া শিখে এই তোমার শিক্ষা হয়েছে? ধিক্—

রেগেমেগে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই তখন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাক্ আমি এর কী বিহিত করতে পারি—

চেঁচামেচি শুনে ইস্কুলের আরো কিছু ছাত্র, কিছু মাস্টার মশাই হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরে উঁকি মারছিল। ঘটনার স্রোত যখন আরও অনেক দূর গড়ালো, তখন তারাও বেশ উত্তেজিত।

টীচার্স কমন-রুমে শশধরবাবু বসেছিলেন।

তিনি মন্তব্য করলেন—আরে, পণ্ডিত আর কী করবে—ওঁর চেঁচামেচিই সার। কমিটি যা করবে তার ওপর হাত দেবার ক্ষমতা কার আছে?

বলাইবাবু বললেন—আরে তা নয়, ইস্কুলের জমি বাগান সব তো নিমাইবাবুর বাবা দিয়ে গেছেন, তাদের নিজেদের সম্পত্তি নিজে বেচছেন, তাতে কার কী বলবার আছে?

—তা ভবরঞ্জনবাবু কী বললে?

—কী আর বলবে? এককালে তো পড়েছে এই পণ্ডিত মশাই-এর কাছে। কিছুই বলতে পারলে না।

একজন বললেন—তাহলে সেক্রেটারি যা করবার করবেন!

শশধরবাবু বললেন—ছাই, ছাই করবেন, সেক্রেটারিও কি মাছের ভাগ পায় না নাকি ভেবেছ? পুকুরের মাছ খায়, বাগানের

আম খায়, নারকোল খায়, এ তো বরাবর খেয়ে আসছে। এ কেউ ওলটাতে পারবে? ওলটাবার সাধ্যি আছে পণ্ডিত মশাই-এর

বলাইবাবু বললেন—আরে, এই তো কোচিং ইস্কুল বন্ধ করবার কত চেষ্টা করেছিল পণ্ডিত মশাই, তা বন্ধ হয়েছে? বন্ধ করতে পেরেছে?

তা সেদিন সকালবেলাই খবর চলে গেল নিমাই সা'র কাছে। 'বলরামপুর ভ্যারাইটি স্টোর্সে'র দোকান তখন সবে খোলা হয়েছে। প্রত্যেক দিন ভোরবেলাই দোকানের ঝাঁপ খোলা হয়।

বিধু কয়াল দৌড়তে দৌড়তে এসে বললে—সা' মশাই, ইস্কুলের বাগানের নারকোল আম সব পাড়া হচ্ছে—

নিমাই সা' মশাই চমকে উঠলো—কে পাড়ছে? পাড়াচ্ছে কে?

—পণ্ডিত মশাই—

—পণ্ডিত মশাই?

নিমাই সা'র যেন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হলো না। নিমাই সা' দোকান থেকে উঠলো।

কিন্তু বলরামপুর হাই স্কুলের ভেতরে তখন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই প্রায় সব গাছ থেকে নারকোল পাড়িয়ে শেষ করে ফেলেছেন। নারকোলগুলো পুকুরের পাড়ে জড়ো করে পাহাড় করা হয়েছে। তারপর আমগাছে উঠেছে নিকিরিরা। অর্ধেক আমও পাড়া হয়ে গেছে ততক্ষণে। দরদস্তুর ঠিকঠাক শেষ করেই একেবারে কাজে নেমেছেন। টাকাও আগে হাত করে নিয়েছেন। নারকোল আর আমের দরও বেশ পেয়েছেন।

সেই সময় নিমাই সা' এসে হাজির। যেন রাগে ফুলছে সে।

কিন্তু রাগ প্রকাশ করতে পারছে না।

এক সময়ে নিমাই সা' বললে—পণ্ডিত মশাই, আপনি হঠাৎ নারকোল পাড়াচ্ছেন যে…

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—হ্যাঁ, নারকোল আর আম, দুটো ফলই বিক্রি করে দিলাম। তিনশো টাকা দর পেলাম। তোমরা টাকা নেই টাকা নেই করছিলে। এখন এই দেখো, এই তিনশো টাকা আয় হলো—

বলে হাতের মুঠো খুলে নোটগুলো দেখালেন।

নিমাই সা' বললে—কিন্তু কমিটি কি আপনাকে বেচবার পারমিশন দিয়েছে? কমিটি কি মত দিয়েছে এতে?

গৌর ভট্টাচার্যি নিজের ছাত্রের মুখ থেকে কথাটা শুনে একটু থমকে গেলেন। তারপর বললেন—কিন্তু মাছ বেচতেই কি কমিটি অনুমতি দিয়েছিল তোমাকে?

—মাছ?

—হ্যাঁ, এই পুকুরের মাছ? মাছ বেচে যে সাতশো টাকা উঠেছিল তাও কি কমিটি জানে?

নিমাই সা' জাত ব্যবসাদার। পিতৃপুরুষের বলরামপুর ভ্যারাইটি স্টোর্স চালিয়ে লক্ষপতি হয়েছে সে। বাবার উত্তরাধিকারী হয়ে সে বাবার সম্পত্তি দশ গুণ বাড়িয়ে নিয়েছে।

হঠাৎ উল্টো চাল চাললো। বললে—তা এই পুকুরের মাছও কি ইস্কুলের?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—ইস্কুলের নয় তো কার? এই জমি, এই পুকুর, এই নারকোল গাছ, আম গাছ, এই ইমারত বাড়ি, জানালা দরজা, কাঠ-কুটো, সবই ইস্কুলের, তোমারও নয়, আমারও নয়—সবই ইস্কুলের সম্পত্তি। তোমার বাবা মথুর সা' মশাই সবই দানপত্র করে লিখে দিয়ে গেছেন ইস্কুলকে—

ততক্ষণে আরো অনেকে এসে জুটেছে ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের ভেতরে।

নিমাই সা' বললে—তা বাবা না-হয় জমি-বাগান পুকুর স্থাবর সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, কিন্তু পুকুরের এই মাছ, গাছের এই নারকোল, আম, তাও কি দিয়ে গেছেন ?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—আমি যতদিন এই ইস্কুলের কর্তা ছিলাম ততদিন এর স্বত্ব সবই ইস্কুল ভোগ করেছে। এখন রাজা বদলেছে বলে কি রাজ্যও বদলে যাবে ?

নিমাই সা' বললে—আগে যা হয়েছে তা হয়েছে। এখন কমিটি হয়েছে, এখন যা করবে সবকিছু কমিটিই করবে—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—দেখ নিমাই, রাজা বদলালেই রাজ্য বদলায় না। রাজ্য সেই একই আছে। মাছের টাকা তুমি নিয়েছ, ওটা বেআইনী হয়েছে। ওটা ইস্কুলের টাকা। ইস্কুলের কল্যাণে ওটা খরচ হওয়া উচিত। তেমনি আজকের নারকোল আর আম বেচার টাকাও ইস্কুলের ফাণ্ডে জমা হবে।

নিমাই সা' বললে—কিন্তু কাজটা কি ভালো করলেন মাস্টার মশাই ? যদি কমিটি আপত্তি করে কিছু ?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তার জবাব যদি কমিটি চায় তো আমি কমিটির কাছে সে জবাব দেবো !

—কিন্তু আমি তো কমিটির প্রেসিডেণ্ট !

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—চুলোয় যাক প্রেসিডেণ্ট! যতক্ষণ আমি ন্যায়ের পথে আছি ততক্ষণ তুমি আমার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। আর আমি যদি আমার নিজের ক্ষতি না করি তো কে আমার ক্ষতি করবে শুনি ?

নিমাই সা' হয়তো একটা উত্তর খুঁজছিল।

কিন্তু গৌর ভট্টাচার্যি মশাই তার আগেই বললেন—যাও নিমাই, এখন কাজের সময় আমায় বিরক্ত করো না—কমিটি ডাকতে হয় ডেকো, যখন আমার ডাক পড়বে, তখন আমি তার জবাব দেবো—

ততক্ষণে ভবরঞ্জন এসে পড়েছে। ভবরঞ্জন যেমন ইস্কুল বসবার আগে আগে আসে তেমনি এসেছে। সে সবকিছু এতক্ষণ দেখছিল,

শুনছিল। কাণ্ড-কারখানা দেখে সেও অবাক।

নিমাই সা' আর দাঁড়ালো না সেখানে। গট গট করে কম্পাউণ্ডের বাইরে চলে গেল।

ভবরঞ্জনকে দেখে গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—এই নাও, এই তিনশো টাকা হরলালকে খাতায় জমা করে নিতে বলো।—

বলে আর দাঁড়ালেন না। জনার্দন এতক্ষণ হতভম্বর মত পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বললেন—জনার্দন, ঠিক সময় গেট বন্ধ করো—

তারপর সকলের স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনেই গৌর ভট্টাচার্যি মশাই গেট পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

মথুর সা' যেদিন জমি-বাগান-পুকুর দানপত্র করে দিয়েছিলেন সেদিন কল্পনাও করেননি যে, একদিন সেই সম্পত্তি নিয়ে এত গণ্ডগোল বাধবে। তিনি কেমন করেই বা কল্পনা করবেন যে, একদিন যুগ বদলে যাবে। শিক্ষার আর মনুষ্যত্বের দামের চেয়ে টাকার দাম আরো বেড়ে যাবে। আর সে যুগে বাস করে কে-ই বা সে-কথা কল্পনা করতে পারতো! তখন কি আর কেউ ভেবেছিল সেই ইস্কুলই আবার আজকের এই 'বলরামপুর হাই স্কুলে'র মত এত বড় ইস্কুল হবে! ভর্তি হবার জন্যে এত ছেলে এসে তদ্বির-তদারক করবে! সেই ফেল-করা ছাত্রদের পড়বার জন্যে আবার এত কোচিং ইস্কুল খোলা হবে?

একদিন ফটিককে ধরে বসলেন পণ্ডিত মশাই।

বললেন—কোথায় থাকিস তুই বল তো? এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস তুই রোজ?

শিবানী বললে—তুমি ওকে এত বকো কেন বলো তো? তুমিও

ওকে পড়াবে না, ওকে নোটবইও কিনে দেবে না, তা ও বাড়ি থাকবে কেন ?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—কেন, আমি ওকে পড়াই না ? সকাল বেলা আমি পড়াতে বসাই না ওকে ? সকালে রোজ দেরি করে ঘুম থেকে উঠলে কী করে পড়াব ?

ফটিক বললে—আমি কোচিং ইস্কুলে পড়বো—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—কেন ? কোচিং ইস্কুলে পড়বি কেন ?

ফটিক বললে—ওরা সব কোশ্চেন বলে দেয়—

—তা ওরা কোশ্চেন বলে দেবে আর তুমি বুঝি সেগুলো মুখস্থ করবে বসে বসে ? ও-সব জোচ্চুরি কারবার আমি তোমাকে চালাতে দেবো না। যদি পড়তে ইচ্ছে থাকে তো বাড়িতে পড়বে। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠবে, উঠে মুখ-হাত-পা ধুয়ে বই নিয়ে বসবে। যেটা বুঝতে পারবে না আমায় জিজ্ঞেস করবে—

বলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ইস্কুল থেকে সেদিন সবে বাড়িতে এসে বসেছেন, হঠাৎ বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা বেজে উঠলো। বাইরে থেকে সুশীল ডাকলে—ফটিক!

ফটিক লাফিয়ে বাইরে যাচ্ছিল। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই ধরে ফেললেন—কোথায় যাচ্ছিস ? কে ডাকছে তোকে ?

শিবানী বললে—যাক না, সারাদিন বাড়িতে বসে থাকবে তা বলে ? ও কি তোমার মত বুড়ো মানুষ ?

—কিন্তু কে, এসেছে কে ? কে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাচ্ছে ?

শিবানী বললে—ও সুশীল, রানীর ভাই।

ফটিক বললে—আমি কতদিন থেকে বলছি একটা সাইকেল কিনে দিতে, তা দেবার বেলায় নেই। আমি যাবো—

গৌর ভট্টাচার্যি রেগে গেলেন—মুখের ওপর আবার জবাব ?

বলে ফটিকের কান ধরলেন জোরে। ধরে মুচড়ে দিয়ে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন।

শিবানী এসে কান ছাড়িয়ে দিলে। বললে—তা'বলে তুমি ওই-রকম করে মারবে ওকে?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তুমিই তো ওকে আদর দিয়ে দিয়ে ওমনি করে তুলেছ। তোমার জন্যেই তো আজ ওর এত বাড় বেড়েছে। নইলে আমার মুখের সামনে ও অমন কথা বলতে সাহস পায়?

শিবানী বললে—তা সাহস পাবে না? তুমি নিজের দোষটা তো দেখবে না, কেবল অন্য লোকের দোষ খুঁজে বেড়াবে। তুমি আমার কথা কখনও ভেবেছ যে, আজ ফটিককে শাসন করছো? আমার মেয়েটাকে তো তুমি নিজে ইচ্ছে করে মারলে, এখন আমার নাতিটাকে পর্যন্ত তুমি মেরে ফেলতে চাও?

বলতে বলতে শিবানীর চোখে বোধহয় জল এসে গিয়েছিল। তা লুকোতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

গৌর ভট্টাচার্যির সেদিন অনেক কথা বলবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আর বলা হয়নি। কাকে বলবেন? কে শুনবে তাঁর কথা? তাঁর মনে হলো কেউ যেন তাঁর নেই আর। একদিন অনেক সাধ করে এখানে দশজনকে বলে-কয়ে, দশজনের কাছে ভিক্ষে করে এই ইস্কুল করেছিলেন। সেদিন নিজের কথা ভাবেননি, নিজের সংসারের কথা ভাবেননি। স্ত্রী সন্তান অর্থ ভবিষ্যৎ কোনও কিছুই গ্রাহ্য করেননি। এক মনে শুধু একটি প্রার্থনাই করেছিলেন—যেন তাঁর এই ইস্কুলটা স্বাবলম্বী হয়। স্বাবলম্বী হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। আর কোনওদিন কোনও কামনাই করেননি। নিজের বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়েছে, তার দিকে পর্যন্ত নজর দেননি। কিন্তু ছাত্রদের মাথায় যাতে জল না পড়ে তার জন্যে ইস্কুলের ছাদ ঠিক সময়ে মেরামত করিয়ে নিয়েছেন। এর ফলে কী লাভ হয়েছে তাঁর? ছাত্রদের ভাল হয়েছে? নিজের ভালো হয়েছে?

সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলতে চলতে গঞ্জ ছাড়িয়ে একেবারে বীরগঞ্জের দিকে চলে গেছেন গৌর ভট্টাচার্যি।

সেই মোবারকপুরের কথাও মনে পড়লো তাঁর। সেদিন বড় মুখ করে খুড়োমশাইকে বলে এসেছিলেন—বলরামপুরে মানুষ আছে।

তা এই কি সেই মানুষ? এই কি সেই মানুষের মন?

হঠাৎ একটা দোকানের সামনে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। দেখলেন, দোকানের বাইরে থরে থরে নতুন সাইকেল সাজানো রয়েছে। সাইকেলেরই দোকান। নিজে কখনও সাইকেলে চড়েননি গৌর ভট্টাচার্যি মশাই। সাইকেল চড়তেই শেখেননি। অন্য লোকে সাইকেলে চড়েছে, তিনি তা দেখে রাস্তার এক পাশে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছেন।

—এই যে, আসুন পণ্ডিত মশাই।

সবাই-ই চেনে পণ্ডিত মশাইকে। কারো না কারো কেউ তাঁর কাছে পড়েছে। চব্বিশ পরগণার দূর দূর প্রান্তে তাঁর নাম ছড়িয়ে গেছে।

সাইকেল কিনবেন নাকি পণ্ডিত মশাই?

গৌর ভট্টাচার্যি জিজ্ঞেস করলেন—কত দাম এসব সাইকেলের?

দোকানদার ছেলেটা বললে—আসুন না, ভেতরে আসুন। ভেতরে এসে বসুন না। ভেতরে আরো নানারকম সাইকেল আছে। নানা-রকম দামের।

গৌর ভট্টাচার্যি সসঙ্কোচে ভেতরে ঢুকলেন। শুধু সাইকেল নয়। আরো নানারকম জিনিস রয়েছে।

—ওগুলো কী? ওই যে পেতলের—

—আজ্ঞে, ওগুলো স্টোভ?

—স্টোভ? স্টোভ মানে? ওতে কী হয়?

—আজ্ঞে, ওতে আগুন জ্বলে। কেরাসিন তেল দিয়ে জ্বালাতে হয়। কাঠের উনুনে ধোঁয়া হয়। ধোঁয়ায় মেয়েদের রাঁধতে কষ্ট হয় খুব। তাই এই সব জিনিস আজকাল উঠেছে। এ তো আজকাল সব বাড়িতেই কিনছে। বাড়ির জন্যে একটা কিনে নিয়ে যান না। আরো অনেক জিনিস বেরিয়েছে। এই দেখুন, নতুন একরকম টর্চ

বেরিয়েছে। এ ব্যাটারিতে চলে। অন্ধকার রাস্তায় সাপ-খোপের ভয় থাকে না। একটা নিয়ে যান পণ্ডিত মশাই, খুব কাজের জিনিস!

গৌর ভট্টাচার্যি মন দিয়ে সব দেখতে লাগলেন। দেখতে লাগলেন আর অবাক হয়ে গেলেন। এই-ই বিজ্ঞান। এর কথাই শিবেন্দু বলেছিল সেদিন। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে এত!

—এই সাইকেলটা দেখুন, নতুন এসেছে। এটার দাম তিনশো তিরিশ টাকা—

—আর এই দেখুন, এটার দাম দু'শো আশি! আপনি এই তিনশো তিরিশ টাকারটা নিয়ে যান। এর পার্টস্‌গুলো ভালো।

আরো অনেক কথা গড় গড় করে বলে গেল দোকানদার ছেলেটা। কিন্তু তখন গৌর ভট্টাচার্যির মাথায় কিছুই ঢুকছে না। তিনি উঠলেন। এরই নাম বিজ্ঞান! এরই নাম জড়বাদ! তাঁর মুখ দিয়ে তখন আর কোনও কথা বেরোচ্ছে না। এই জিনিসই কিনবে বলে বায়না ধরেছিল ফটিক। সবাই-ই কিনছে, সুশীলও কিনেছে—নরেনের ছেলে সুশীল। ইস্কুলেও অনেক ছেলে সাইকেলে করে আসে।

আবার রাস্তায় আসতে আসতে কথাগুলো মাথার ভেতরে ঘুরতে লাগলো। কত কী বদলে গেছে বলরামপুরের। কত পরিবর্তন হয়েছে চারদিকে। কত বছর এদিকে আসেননি তিনি। শুধু ইস্কুল আর বাড়ি, কেবল এই-ই করেছেন।

বাড়িতে এসে দেখলেন শিবানী রান্নাঘরে নিজের কাজে ব্যস্ত।

দাওয়ার ওপর ফটিক বই নিয়ে বসেছে।

গৌর ভট্টাচার্যি আস্তে আস্তে দাওয়ায় উঠে ফটিকের পাশে গিয়ে বসলেন।

বললেন—কী পড়ছিস রে?

ফটিককে হঠাৎ বড় আদর করতে ইচ্ছে হলো যেন। কেন যেন মনে হলো ফটিকের কোনও দোষ নেই। সব দোষ তাঁর নিজের। তিনিই যেন সংসারে একজন বড় অপরাধী।

—হ্যাঁ রে, ফটিক, তুই সাইকেল কিনবি ?

ফটিকও অবাক! এমন করে আগে কখনও দাদু তার সঙ্গে কথা বলেনি।

—তুমি কিনে দেবে ?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—আমার যে অত টাকা নেই বাবা, আমি কী করে কিনে দেবো ?

—কেন তোমার টাকা নেই ? সকলের তো টাকা আছে! সুশীলের বাবার কত টাকা, সন্তোষের বাবার কত টাকা! সুশীলের বাবা সুশীলকে এবার একটা ক্যামেরা কিনে দেবে, তা জানো ? তুমি আমায় কিচ্ছু কিনে দাও না—

গৌর ভট্টাচার্যি ফটিককে এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন—পৃথিবীতে কি সবাই-এর টাকা থাকে রে ? সকলের টাকা থাকে না। টাকা থাকলেই মানুষ বড় হয় না।

—কিন্তু টাকা থাকলে কেমন কত ভালো ভালো জিনিস কেনা যায় !

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—সেই জন্যেই তো তোমাকে মন দিয়ে অত লেখাপড়া করতে বলি বাবা! লেখাপড়া করলে দেখবে, বাবা, টাকায় মানুষ বড় হয় না। মানুষ বড় হয় মনুষ্যত্বে। যিশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণদেব, কারোর টাকা ছিল না, তাঁরা কি বড় নয় ? তাহলে চৈতন্যদেবের ছবি অত বাড়িতে বাড়িতে টাঙানো থাকে কেন ? তাঁর কি টাকা ছিল ? ভালো করে লেখাপড়া করলে তখন বুঝতে পারবে আমার কথা! ভগবান তো আমাদের মাথার ওপরে বসে বসে দেখছেন সব! তিনি বিচার করেন না কার কত টাকা আছে। তিনি মানুষকে বিচার করেন মানুষের ভক্তি দিয়ে। ভক্তি, দয়া, ত্যাগ, সংযম দিয়ে। বড় হলে দেখবে শ্রীমদ্‌ভগবতে লেখা আছে—যদি দাস্যসি মে ভামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ, কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম ; তার মানে, প্রহ্লাদ বলছেন—হে বরদাতাগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আমার ঈপ্সিত বর দেন, তবে এই বর দিন যে, আমার

হৃদয়ে যেন কোনও [illegible] উদ্রেক না হয়—কথাটা বুঝলি? সংস্কৃত না পড়লে···

হঠাৎ শিবানী এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—আবার সংস্কৃত উপদেশ দিচ্ছ ওকে? সাইকেল কিনে দিতে পারো না একটা, তার ওপর··· যাও, খেয়ে নিয়ে আমায় ছুটি দাও—ওঠো···

এসব অনেক আগেকার কথা। কিন্তু তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে গঞ্জের ইছামতী নদীর ঘাট দিয়ে। অনেক ভুগে অনেক ঠেকেও কিন্তু তখনও গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর মতিগতি বদলায়নি।

নরেন চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে সেদিন নিমাই সা' বললে—মাস্টার মশাই-এর জ্বালায় তো আর পারা যাচ্ছে না হে ভাই। এর তো একটা বিহিত করতে হয়। মাস্টার মশাই-এর নামে একটা মামলা ঠুকে দেবো?

নরেন বললে—তুমি কি পাগল হলে নিমাই? মামলা হলে কমিটিরই মুখ পুড়বে। উনি যখন আর এ নিয়ে কিছু বলছেন না তখন ঘাঁটিয়ে লাভ কী?

নিমাই সা' বললে—আজ না-হয় কিছু বলছেন না, আজ মাছের কথা তুললেন, নারকোল আম পেড়ে বেচে দিলেন, কিন্তু এর পরে যদি আরো বাড়াবাড়ি করেন? যদি বলেন ইস্কুলের আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখবো? তখন? তখন কী করবে?

নরেন চক্রবর্তী বললে—তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে, এখন যখন সব একরকম মিটে গেছে তখন চেপে যাও না?

নিমাই সা' বললে—এই করে করেই তো মাস্টার মশাই অত প্রশ্রয় পেয়ে গেছেন—

তারপর একটু থেমে বললে—ঠিক আছে, যখন বলছো তুমি তখন চেপে যাচ্ছি, কিন্তু এও বলে রাখছি এর পরিণাম ভালো হবে না—

কথার মাঝখানেই হঠাৎ পণ্ডিত মশাই ঢুকে পড়লেন।

পণ্ডিত মশাইকে এমন অসময়ে দেখেই নরেন চক্রবর্তী আর নিমাই সা' দু'জনেই চমকে উঠলো।

নরেন চক্রবর্তী কিন্তু এক মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। বললে—আসুন মাস্টার মশাই, আসুন—

পণ্ডিত মশাই বললেন—না, আমি বসবো না আর, এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে, তাই ঢুকে পড়লাম—

তারপর নিমাই সা'র দিকে চেয়ে বললেন—নিমাই, তুমিও আছ এখানে, ভালোই হয়েছে, দেখ, একটা কথা আমি অনেকদিন থেকে ভাবছি। শশধর, আমাদের অঙ্কের মাস্টার শশধর, এখানে কোচিং ইস্কুল করেছে, তা তো জানো। আমাদের ইস্কুলের ছেলেরা সব ওখানে ভর্তি হয়েছে। আমার নাতিটাও একটা বখাটে হয়ে গেছে বাপের দোষে। সেও বলে—ওই কোচিং ইস্কুলে পড়বো। ওখানে কী হয় জানো? সব প্রশ্নপত্র বলে দেওয়া হয়—

—প্রশ্নপত্র বলে দেওয়া হয়? নরেন চক্রবর্তী যেন একটা দুঃসংবাদ শুনলো হঠাৎ।

পণ্ডিত মশাই বললেন—হ্যাঁ, আমি খবর নিয়েছি, গুজবটা মিথ্যে নয়। বিজ্ঞানের মাস্টার শিবেন্দুও আমাকে তাই বলেছে।

নরেন চক্রবর্তী বললে—কিন্তু তারা কী করে প্রশ্নপত্র জানতে পারে?

পণ্ডিত মশাই বললেন—জানা খুব সহজ। আমি সব ভেবে দেখেছি। মাস্টার মশাইরা প্রশ্নপত্র করে ভবরঞ্জনের কাছে জমা দেয়। জমা দেবার আগে অন্য মাস্টারদের দেখায়। তখনই জানাজানি হয়ে যায়। এবার ভেবেছি ও-প্রথাটাই খারাপ! ওতে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়!

—তা হলে কে প্রশ্নপত্র তৈরি করবে?

—কেন, প্রশ্নপত্র তৈরি করবার জন্যে একটা কমিটি থাকবে। কমিটিতে তুমি আমি আর ভবরঞ্জন থাকুক। প্রত্যেক শিক্ষককে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে দু'শোটা প্রশ্ন করতে বলা হবে, তার থেকে আমাদের কমিটি দশটা করে প্রশ্ন বেছে নেবে। তারপর আমি কলকাতায় গিয়ে সেসব ছাপিয়ে নিয়ে আসবো—

নরেন চক্রবর্তী একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে—কিন্তু মাস্টার মশাই, এই বয়েসে আপনি এত পরিশ্রম করতে পারবেন?

পণ্ডিত মশাই বললেন—বলছো কী তুমি? আমার বয়েসটাই তুমি দেখলে, আর প্রাণটা তো তুমি দেখলে না? তুমিও দেখলে না, এই নিমাই সামনে রয়েছে, নিমাইও দেখলে না। এখনও ছাত্রদের জন্যে প্রাণ দিতে পারি, তা জানো?

নিমাই সা' এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবার বললে—কিন্তু আমার প্রেস থেকে কখনও প্রশ্ন বাইরে বেরোয় না, তা আপনাকে বলে রাখছি—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না বেরোয় সে তো ভালো কথা। কিন্তু একবার বাইরে ছাপিয়ে দেখাই যাক না। তুমি শেষকালে কেন বদনামের ভাগী হবে বাবা? তুমি এত দায়িত্ব কেন নেবে?

নিমাই সা' বললে—কিন্তু তা করতে হলে কমিটির মত নিয়ে তবে এসব করতে হবে।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—দেখ, কমিটিতে কথাটা ওঠাতে চাও ওঠাও, কিন্তু তোমাদের যদি সদিচ্ছে থাকে তবেই এ কাজ হবে, নইলে ইস্কুল থেকে মানুষ বেরোবে না আর, গরু-ছাগল বেরোবে—আচ্ছা, এখন আমি তাহলে চলি—

বলে আর দাঁড়ালেন না। আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

নরেন চক্রবর্তী বললে—মাস্টার মশাই-এর মাথায় যখন একবার ঢুকেছে, তখন ও করে ছাড়বেনই, ওঁকে আর নড়ানো যাবে না—

নিমাই সা' বললে—কিন্তু টীচাররা ? টীচাররা কি রাজী হবে ? টীচারদের আত্মসম্মানে যদি ঘা লাগে ? তাদের তো ভাতে হাত পড়বে। তিনটে কোচিং ইস্কুল অলরেডি গজিয়ে উঠেছে বলরামপুরে।

—কিন্তু তোমার প্রেসের কাজটাও তো গেল।

নিমাই সা' বললে—আমার প্রেসের ক্ষতি করবে কে ? কার এত ক্ষমতা আছে ? ইস্কুলের সব কাজ কি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে করা সম্ভব হবে ? আর যদি তা-ই হয় তো আমিও ছাপার রেট বাড়িয়ে দেবো ! আর তারপরে বোর্ডে আমার লোক আছে, দেখি না কতদূর বাড়তে পারেন মাস্টার মশাই—

গৌর ভট্টাচার্যি বাড়িতে ফিরেই জিজ্ঞেস করলেন—আজকে যে ফটিককে দেখছিনে ? ফটিক কোথায় গেল ?

কিন্তু ফটিক তখন থিয়েটারের ক্লাব-ঘরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে ডি-সার্পে গান ধরেছে—

তব হৃদয়-সরসী নীরে

শতদল সম ফুটিয়া উঠুক মম মন ধীরে ধীরে—

উর্বশীর পার্ট করছিল ফটিক। ওদিকে যে রাত বেড়ে যাচ্ছিল সেদিকে ফটিকের খেয়ালই নেই। মিশ্র খাম্বাজের সুরে তালে লয়ে তখন সে যেন সত্যিই উর্বশী হয়ে গেছে।

সুশীল গায়ে টোকা দিয়ে বললে—ওরে, বাড়ি চল ফটিক, দেরি হয়ে গেছে রে—তোর দাদু বোধ হয় এতক্ষণ বাড়ি এসে গেছে—

—দূর—ফটিক রেগে গেল। বললে—তুই আচ্ছা বেরসিক।

তারপর বললে—জানিস না, আজকাল আমার দাদু খুব দেরি করে বাড়ি আসে—

সুশীল বললে—তাহলে আমি যাই ভাই, শশধরবাবু এসে বসে থাকবে, শেষকালে দিদি বাবাকে বলে দেবে—

বলে সুশীল উঠে পড়লো।

কিন্তু পণ্ডিত মশাই-এর বাড়িতে তখন খোঁজ পড়ে গেছে ফটিকের।

গৌর ভট্টাচার্যি মুখ-হাত-পা ধুয়ে এসে আবার খোঁজ করলেন ফটিকের। বললেন—কই, ফটিক কোথায় গেল বলছো না যে?

শিবানী বললে—এই তো বললুম, সে সুশীলদের বাড়িতে গেছে পড়তে।

—সুশীলদের বাড়িতে পড়তে গেছে? কেন? ওদের বাড়িতে পড়তে গেছে কেন?

শিবানী বললে—তা কী করবে? তুমি থাকবে তোমার ইস্কুল নিয়ে, এদিকে কোচিনেও তাকে ঢুকিয়ে দেবে না। তাহলে সে করেটা কী? সামনে পরীক্ষা আসছে, সে কী করবে? একে-ওকে ধরে পড়া বুঝে নেয়। সুশীলের বাবা সুশীলের জন্যে তিনটে মাস্টার রেখেছে—তুমি ফটিকের জন্যে ক'টা মাস্টার রেখেছ শুনি?

হঠাৎ বাসন্তী এসে হাজির। সঙ্গে রানীও রয়েছে।

বাসন্তী বললে—খুড়ীমা, ফটিক বাড়ি এসেছে?

শিবানীর মুখে কথা বন্ধ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

গৌর ভট্টাচার্যি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—বৌমা, ফটিক তোমাদের বাড়ি যায়নি?

বাসন্তী বললে—আমাদের বাড়ি কেন যাবে সে? সে তো সুশীলের সঙ্গে বেরিয়েছিল বিকেলবেলা। ছু'জনেই তো সাইকেল নিয়ে বেরোল—

—তবে যে তোমার খুড়ীমা বললেন, সে তোমাদের বাড়ি পড়তে গেছে?

শিবানী গলা চড়িয়ে দিলে। বললে—আমি কী করে জানবো সে কোথায় গেছে? আমার কি সংসারে কাজ নেই, আমি তোমার

নাতির পেছন-পেছন পাহারা দিয়ে বেড়াবো? তুমি কি আমার জন্যে দশটা ঝি রেখে দিয়েছ নাকি?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—ওই দেখ, আমি কী বললাম আর তুমি কী বুঝলে?

শিবানী বললে—আমি বুঝি গো সব বুঝি, লেখাপড়া শিখিনি বলে মনে কোর না আমি কিছু বুঝি না। ওই বউমা রয়েছে, ওরা বলুক না, ওরা তো কানা নয়, ওদেরও চোখ আছে—ওরাই বলুক আমি অন্যায় বলেছি না তুমি অন্যায় বলেছ?

রানী বলে উঠলো—তুমি থামো না দিদিমা। তুমি কি সব সময় কেবল দাদুর সঙ্গে ঝগড়া করবে?

হঠাৎ পাঁচুর মা এসে ঢুকলো—মা, খোকাবাবু বাড়ি ফিরেছে—

—বাড়ি ফিরেছে?

বাসন্তী যেন অকূলে কূল পেলে। বললে—আয় রানী, আয়—

বলে বাইরে চলে গেল। কিন্তু রানী পণ্ডিত মশাই-এর কাছে গিয়ে বললে—দিদিমা যা-ই বলে বলুক, তুমি চুপ করে থাকো দাদু—

গৌর ভট্টাচার্যি হাসলেন। বললেন—তুই যা রে, তোর মা চলে গেল, ভাববে আবার—

রানী বললে—তুমি আগে কথা দাও তুমি ঝগড়া করবে না দিদিমার সঙ্গে।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—হ্যাঁ রে, আমি বুঝি শুধু তোর দিদিমার সঙ্গে ঝগড়াই করি?

রানী বললে—ও সব বললে শুনবো না, তুমি কথা দাও আগে ঝগড়া করবে না?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—আচ্ছা, কথা দিলাম ঝগড়া করবো না—

—তাহলে আরো কথা দাও ফটিক এলে তাকেও তুমি মারবে না?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—কিন্তু সে আমার কথা শোনে না কেন মা? আমি তো তার ভালোর জন্যেই বলি। কেন সে পড়ে না? কেন সে ইস্কুল থেকে বাড়ি আসে না? আমি কি তাকে কোনও খারাপ কথা বলি? আমি কি তার খারাপ চাই? তাকে ভালো হতে বলে আমি কীসের দোষ করেছি বল্ তো?

রানী বললে—দোষ তো তোমারই দাদু?

—দোষ আমার?

—দোষ তোমার নয়? তুমি যে সকলকে মারো। অত মারলে কি কেউ ভালো হয়?

গৌর ভট্টাচার্যি যেন একটু ভাবনায় পড়লেন। যেন একটু আত্মসমালোচনা করতে লাগলেন।

বললেন—কিন্তু মা, তুই? তোকেও কি আমি মারি রে?

রানী বললে—আমার কথা আলাদা, আমাকে যে তুমি ভালো-বাসো দাদু। আমার মত তুমি সবাইকে ভালোবাসতে পারো না?

কী জানি কী মনে হলো! কথাটা মন থেকে মোটেই মুছতে পারলেন না। রানী অনেকক্ষণ বাড়ি চলে গেছে। অনেক রাতও হয়েছে তখন। ফটিকও এসেছে। এত বড় মিথ্যেটাও যেন তিনি রানীর কথায় হজম করে নিলেন। সত্যিই হয়তো তাঁরই নিজের ভুল। নইলে রানী তাঁকে ও-কথা বললে কেন? তিনি কি কাউকেই ভালবাসেননি? কারোরই মঙ্গল চাননি? না কি মঙ্গল করতে চাওয়া আর ভালবাসা এক জিনিস নয়! সেই শ্রীমদ্‌ভগবতের কথাটাও আবার মনে পড়লো। ফটিককে সেদিন শুনিয়েছিলেন। যদি দাস্যসি মে···প্রহ্লাদের সেই প্রার্থনা—হে বরদাতাগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আমার ঈপ্সিত কোনও বর দাও তবে এই বর দাও—যেন আমার মনে কখনও কামনার উদ্রেক না হয়···

কিন্তু গোর ভট্টাচার্যির দেবতারা বোধ হয় অত সহজে তাঁকে কামনা-বাসনা রহিত করতে চাননি। বোধ হয় তাঁকে আরো পরীক্ষা করতে চাইছিলেন। বোধ হয় দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে শোধন করে তবে তাঁকে পরিত্রাণ দিতে চাইছিলেন।

সেদিন বিনোদ আবার একটা চিঠি দিলে। কবেকার সেই বিনোদ। এতটুকু সেই ছেলে। দুঃখ-কষ্ট করে তার বিধবা মা তাঁর কাছে একদিন তাকে নিয়ে এসেছিল। বিনোদকে মাইনে দিতে হতো না। পরের বাড়ি চেয়ে-চিন্তে তাকে মানুষ করেছিল তার মা।

বিনোদের মা বলতো—বাবাঠাকুর, ও আপনারই ছেলে, আমি শুধু নামে মাত্তোর পেটে ধরেছি—

ওই যেমন রানী। বৌমা বলে—ও আপনারই মেয়ে খুড়ো-মশাই, আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই-ই করবেন—

চিঠিখানা বার বার পড়ে আবার ভাঁজ করে পকেটে পুড়লেন।

ইস্কুলময় শোরগোল পড়ে গেছে এবার। মাস্টার মশাইদের কমন-রুমে বিক্ষোভগুলো জমেই ছিল এতদিন। এবার তা বোমার মত বুঝি ফেটে পড়বে। বিনোদ আগে যখন এসেছিল তখন বলেছিল—আজকাল সে ইস্কুল আর আগেকার মত নেই মাস্টার মশাই—। আপনি আবার নিজে সব দেখুন—

গৌর ভট্টাচার্যি বলেছিলেন—এখন যে ইস্কুল দেখবার কমিটি আছে বিনোদ—

বিনোদ বলেছিল—তা কমিটিতেই না-হয় থাকুন—

গৌর ভট্টাচার্যি বলেছিলেন—আমার বয়েস হয়ে গেছে, আমি

আর কতদিন দেখবো। এখন ওরা রয়েছে, ওরাই দেখুক—ওই নিমাই সা', নরেন···

—ওরা কি আপনাকে কমিটিতে থাকতে বলেছিল?

গৌর ভট্টাচার্যি বলেছিলেন—না—

বিনোদ বলেছিল—আমার দুঃখ হয় মাস্টার মশাই, আপনার মত একজন মানুষকে ওদের কমিটির মধ্যে নিলে না। ওরা হীরে ফেলে কাচ বাঁধলে আঁচলে। জানেন মাস্টার মশাই, এ আপনার দোষ নয়, ওদের দোষ নয়, এ এই যুগেরই দোষ। এখন কেউই গুণের কদর করে না। আমাদের গভর্মেন্টও না। আজকাল গুণী শিক্ষকদের বছরে বছরে কত হাজার-হাজার টাকার প্রাইজ দেওয়া হয়, কই, তাতে আপনার নাম তো কেউ ওঠায় না!

—ও তুমি ছেড়ে দাও বিনোদ। তুমি তো সংস্কৃততে ভালো ছাত্র ছিলে। সেই শ্রীমদ্‌ভগবত গীতার সেই শ্লোকটা, যেখানে প্রহ্লাদ বলছেন···

বিনোদ বলেছিল—সব জানি মাস্টার মশাই, যদি দাস্যসি মে···

—তবে আবার ও-কথা বলছো কেন তুমি বিনোদ? আমি যে তোমাদের পড়িয়েছি, ওই নিমাই সা', নরেন, ভবরঞ্জন, সকলকেই পড়িয়েছি, কখনও কি চেয়েছি তোমাদের পড়িয়ে আমি রাজা হবো? এই যে তুমি—তুমি বড় হয়েছ, এইটেই তো আমার পুরস্কার বাবা। আমি তো আর কিছু চাইনি। তোমরা পেলেই তো আমার পাওয়া হলো—

বিনোদ তবু যেন খুশী হয়নি সেদিন কথাগুলো শুনে। কিন্তু তার কথাগুলো আজও মনে আছে গৌর ভট্টাচার্যির।

বাইরে ইস্কুলের পরীক্ষার ঘরে ঘরে ছেলেরা পরীক্ষা দিচ্ছে। চিঠিটা পকেটের মধ্যে ভাঁজ করে পুরে তিনি উঠলেন। জনার্দনকে বললেন—জনার্দন, আমার ঘরটায় চাবি বন্ধ করে দাও, আমি একটু ঘুরে আসি—

অনিমেষবাবু সকাল থেকে পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি বুড়ো হয়ে

গেছেন এখন। এখন খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেই ঘুম আসে। হঠাৎ এক-একবার চোখ খুলে দেখেন কেউ টোকাটুকি করে কিনা। সবাই খসখস করে খাতার ওপর উত্তর লিখে যাচ্ছে। সকাল বেলা একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। মাঝখানে আধঘণ্টা বিশ্রাম। তখন কমন-রুমে গিয়ে এক কাপ চা আর দুটো বিড়ি খেয়ে আসা। তারপরেই আবার দ্বিতীয় পত্র।

বিকেলবেলার দিকে হঠাৎ নজরে পড়লো পণ্ডিত মশাই-এর নাতি ক্লাশের শেষের দিকে বসে যেন বই থেকে উত্তর লিখছে। চাদরটা কাঁধে তুলে নিয়ে সেখানে যেতেই দেখলেন, অবাক কাণ্ড। পাশে একটা বই খোলা। জামার তলায়ও যেন অনেক বই-খাতা লুকোন রয়েছে।

অনিমেষবাবু বললেন—দেখি, ওটা কী বই, দেখি?

ফটিক তখন বইখানা কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছে।

অনিমেষবাবু আবার বললেন—দেখি, কী বই লুকোলে?

ফটিক বোধ হয় একটু ভয় পেয়ে গেল। অনিমেষবাবু আর কিচ্ছু বললেন না। আবার নিজের জায়গায় এলেন। তারপর কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে চলে গেলেন হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরে। সারা স্কুলে তখন সমস্ত ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে।

অন্য দিনের চেয়ে শান্ত আবহাওয়া।

হেডমাস্টার মশাই সব শুনলেন।

বললেন—আমার কাছে তাকে একবার ডেকে নিয়ে আসুন তো—

ফটিক এক মনে তখনও লিখছিল।

অনিমেষবাবু বললেন—ওঠো, হেডমাস্টার মশাই তোমাকে ডেকেছেন—

ফটিক ভয় পেয়ে গেছে খুব। বললে—আর করবো না স্যার, আমায় ছেড়ে দিন স্যার—

ধমকে উঠলেন অনিমেষবাবু। বললেন—যা বলছি তাই করো, চলো আমার সঙ্গে, এসো—

ফটিক থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে অনিমেষবাবুর পেছন-পেছন হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো।

হেডমাস্টার বললেন—তুমি বই থেকে নকল করছিলে?

ফটিক কোনও উত্তর দিলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—বলো, জবাব দাও?

তারপর অনিমেষবাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি দেখেছেন একে বই থেকে নকল করতে?

অনিমেষবাবু যা দেখেছিলেন বললেন। তারপর আর কিছু না বলে হঠাৎ ফটিকের সার্টটা ওপর দিকে তুলে ধরলেন। তুলে ধরতেই দেখা গেল ফটিকের বুকে-পিঠে সারা গায়ে থরে থরে বই-খাতা সাজানো। তারপর পকেটের ভেতরে হাত দিতেই বেরোল একগাদা টুকরো টুকরো কাগজ।

রাগে ভবরঞ্জনবাবু ফেটে পড়লেও কোনও রকমে নিজেকে শান্ত করলেন।

বললেন—তোমার লজ্জা করে না এইভাবে এগজামিন দিতে আসতে? জানো, তোমাকে এখুনি ইস্কুল থেকে কান ধরে বার করে দিতে পারি?

ফটিক এতক্ষণে কেঁদে ফেলবার যোগাড় করলে।

বললে—আমি আর কখনও এমন করবো না স্যার—

ভবরঞ্জনবাবু রাগের চোটে টেবিলের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি মারলেন।

বললেন—অনিমেষবাবু, বইগুলো সব টেনে বার করে নিন তো—

অনিমেষবাবু একে একে সব বইগুলো টেনে বার করে হেড-মাস্টার মশাই-এর টেবিলের ওপর রাখলেন।

ভবরঞ্জনবাবু চিৎকার করে উঠলেন—কান ধরো—ধরো কান—

ফটিক কান ধরলো।

ভবরঞ্জনবাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—লজ্জা করে না তোমার কাঁদতে? আবার কাঁদছো?...তুমি জানো না তুমি কার নাতি?

জানো তোমার বদনাম হলে তোমার দাদুর মনে কত আঘাত লাগবে? তোমার এতটুকু ভয় নেই, তুমি তোমার দাদুর নাম পর্যন্ত ডোবাতে চাও?

তারপর আর প্রসঙ্গটা বাড়াতে চাইলেন না। ওদিকে তখন সময় বয়ে যাচ্ছে।

বললেন—যাও—যাও এখান থেকে—গিয়ে লেখ গে যাও—

তক্ষণে হইচই-এর শব্দ শুনে চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে। পিওন, বেয়ারা, দারোয়ান সকলের কানে কানে চলে গেছে কথাটা। অনেকে উঁকি দিয়ে দেখেও গেছে। কথাটা কানে কানে টিচারদের কমন-রুমেও পৌঁছে গেছে। জনার্দনও শুনেছে খবরটা।

ভবরঞ্জন তখন আবার নিজের কাজে মন দিয়েছে। হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে হাঁফাতে হাঁফাতে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই এসে হাজির।

বললেন—ভবরঞ্জন, ফটিক বই দেখে টুকছিল শুনলাম। খবরটা সত্যি?

ভবরঞ্জন মাস্টার মশাই-এর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাকে সাবধান করে দিয়েছি—

—সাবধান করে দিয়েছ মানে?

ভবরঞ্জন বললে—আমার সামনে কান মলেছে। বলেছে, আর কখনও অমন করবে না—

—করবে না মানে? তুমি তাকে আবার পরীক্ষা দিতে দিয়েছ নাকি?

ভবরঞ্জন বললে—আজ্ঞে, ছোট ছেলে তো! আমি তাকে খুব ধমকে দিয়েছি। এই যে বইগুলো দেখছেন, এইগুলো ওর কাছে ছিল, এগুলো কেড়ে নিয়েছি। এখন আবার গিয়ে পরীক্ষা দিতে বসেছে।

—কিন্তু কেন তুমি তাকে আবার পরীক্ষা দিতে দিলে? কেন তাকে ঘাড় ধরে ইস্কুলের বাইরে বার করে দিলে না? আমার নাতি বলে? অন্য লোকের নাতি হলে তুমি তাই করতে, শুধু আমার

নাতি বলেই তুমি তাকে ক্ষমা করলে?…তুমি ডাকো তাকে। ডেকে পাঠাও এখানে, এক্ষুনি ডেকে পাঠাও—

বেয়ারাকে দিয়ে আবার তখ্‌খুনি ফটিককে ডেকে আনা হলো। দাত্বকে দেখে ফটিক ভয়ে শিউরে উঠেছে।

—তুই এইসব বই দেখে টুকছিলি? এইসব বই তোর জামার তলায় ছিল? বল্—

ফটিক সেইখানে দাঁড়িয়েই থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

—বল, এসব বই থেকে টুকছিলি কিনা?

সমস্ত বাড়িটা যেন গৌর ভট্টাচার্যির চিৎকারে থমথম করতে লাগলো।

—জবাব দে?

তখনও কোনও জবাব নেই ফটিকের মুখে। সে যেন কথা বলবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে।

গৌর ভট্টাচার্যি আর দেরি করলেন না। ভবরঞ্জনের আলমারিটা পাশেই ছিল। সেটা খুলে তার ভেতর থেকে বেতটা বার করলেন। তারপর সেটা নাচাতে নাচাতে ফটিকের সামনে গিয়ে উঁচু করে ধরলেন।

বললেন—জবাব দিবি নে তো?

বলে আর দেরি করলেন না। সপাং সপাং করে ফটিকের মাথায়, মুখে, পিঠে, হাতে জোরে জোরে মারতে লাগলেন। মারতে মারতে পণ্ডিত মশাই-এর কাঁধ থেকে চাদরটা খসে মাটিতে পড়ে গেল। তবু যেন তাঁর খেয়াল নেই। সেই অবস্থাতেই মারতে মারতে ফটিককে মাটিতে ফেলে দিলেন। ফটিক পড়ে গেছে তখন মেঝের ওপর। তবু পণ্ডিত মশাই তাকে মেরে চলেছেন।

ভবরঞ্জন আর থাকতে পারলে না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে মাস্টার মশাই-এর হাতটা চেপে ধরেছে।

বললে—করছেন কী, মাস্টার মশাই? মারা যাবে যে?

—তুমি ছাড়ো।

বলে আবার মারতে লাগলেন। তখন ফটিক অসাড় হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। ঘরের দরজার সামনে ভিড় জমে গেল মানুষের। গৌর ভট্টাচার্যির এ রূপ যেন কেউ এর আগে কখনও দেখেনি। এ এক অমানুষিক শাসন। এই শাসনও আগে কখনও কেউ দেখেনি।

হঠাৎ মনে হলো ফটিক যেন আর নড়ছে না। ফটিক যেন স্থির হয়ে গেছে। তার যেন প্রাণ-স্পন্দন নেই। সে তখন নিশ্চল নিথর হয়ে পড়ে আছে গৌর ভট্টাচার্যির পায়ের কাছে।

রাত্রে সমস্ত বাড়িটা থমথম করছিল।

পাশের ঘরে ডাক্তার এসে দেখছিল। তবু গৌর ভট্টাচার্যি মশাই একবারও ওঠেননি। তিনি স্কুল থেকে যথাসময়ে বেরিয়ে সেই যে বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন বাসন্তী এসেছিল, নরেন এসেছিল। রানীও এসেছিল। সবাই এসে ফটিককেই দেখে গেছে, ফটিকের কাছেই ভিড় করেছে।

নরেনই ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিল খবরটা শুনে।

বীরগঞ্জের ডাক্তার। ভালো করে পরীক্ষা করলে ফটিকের বুক হাত পিঠ।

নরেন জিজ্ঞেস করলে—কী রকম দেখছেন?

ডাক্তার স্টেথিসকোপ দিয়ে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করতে লাগলো।

বললে—জ্বর রয়েছে, এ-জ্বর আরো বাড়বে—

কয়েকটা ওষুধ লিখে দিয়ে গেল ডাক্তারবাবু। নরেন নিজেই গিয়ে দোকান থেকে সে-সব নিয়ে এসেছে। ডাক্তারকেও ভালো বলতে হবে। অন্য কোনও রোগী হলে এমন করে কখনও দেখতো

না। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর নাতি। ইস্কুলের এত বড় পণ্ডিত মশাই-এর ব্যাপার। বলরামপুরের সমস্ত বাড়িতে এ নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে। এই রোগীর যদি কিছু হয় তাহলে ডাক্তারের নামও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে।

নরেন জিজ্ঞেস করলে—কালকেও আবার পরীক্ষা আছে এর, কালকে ইস্কুলে যেতে পারবে তো ?

ডাক্তার বললে—একটা ভরসা, কিডনীটা বেঁচে গেছে।

—কিন্তু জ্বর ?

ডাক্তার বললে—জ্বরের ওষুধ তো দিলাম—

তারপর দেখা-শোনা করার পর ডাক্তার উঠলো। ফটিক তখনও বিছানায় অজ্ঞান অচৈতন্য-প্রায় হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চাইছে বটে। কিন্তু কাউকেই যেন চিনতে পারছে না।

ডাক্তার বললে—আমি রাত্রের দিকে আর একবার আসবোখন—

বাসন্তী, রানী, তারাও চুপ করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। শিবানী সেই যে ফটিকের পাশে গিয়ে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করেছে, তার আর বিরাম হয়নি। যখন বরফ এল তখন সেই বরফ নিয়ে মাথায় লাগিয়েছে। বাড়িতে একটা আইস-ব্যাগ নেই, জ্বর দেখবার থার্মোমিটার নেই। কোনও কিছু সরঞ্জাম নেই পণ্ডিত মশাই-এর বাড়িতে। নরেন সবই তার নিজের বাড়ি থেকে আনিয়েছে।

নরেন বললে—খুড়ীমা, আপনি এবার উঠুন—

বাসন্তী বললে—হ্যাঁ খুড়ীমা, আমি তো রয়েছি, তুমি এবার ওঠো, খুড়োমশাইকে খেতে দাও—

কিন্তু ওইটুকু মেয়ে যে রানী, তার মুখে যেন তখন সমস্ত কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। সে শুধু দেখছে সব। এই দাদু, এই দিদিমা, এই স্নেহ, এই শাসন—সব কিছু দেখে সে তখন বিহ্বল হয়ে গেছে একেবারে।

এক সময়ে নরেন, বাসন্তী, রানী সবাই চলে গেল। রাত তখন

গম্ভীর হলো। একলা ফটিক অকাতরে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, আর তার পাশেই শিবানী।

হঠাৎ ডাক্তার আবার এল। এসে দেখলে কেমন আছে রোগী।

আবার স্টেথিসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করলে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে। না, রোগী আগের চেয়ে অনেক ভালো।

যাবার সময় পাশের ঘরের দিকে নজর পড়তেই দেখলে, পণ্ডিত মশাই নিজের বিছানার ওপর স্থির নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। ডাক্তারকে দেখতে পেয়েই চোখ তুললেন।

বললেন—কেমন দেখলে ?

ডাক্তার বললে—ভালো, আগের চেয়ে অনেক ভালোর দিকে। খুব কড়া ডোজ ওষুধ দিয়েছিলাম। তাতেই কাজ হয়েছে মনে হচ্ছে—

তারপর একটু থেমে বললে—অমন করে কেন মারতে গেলেন মাস্টার মশাই ওকে। খুব ভাগ্য ভালো যে কিডনীটা বেঁচে গেছে। বেতটা আর একটু পাশে পড়লেই সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকতো না—

পণ্ডিত মশাই বললেন—কাল আবার পরীক্ষা, পরীক্ষায় কাল বসতে পারবে তো ?

ডাক্তার বললে—দেখা যাক—

বলে বাইরে বেরিয়ে গেল ডাক্তার।

একটা তো রাত। একটা রাতের মধ্যে অনেক কিছু বিপর্যয় ঘটতে পারে। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর কাছে সে এক আশ্চর্য আত্ম-পরীক্ষার রাত। পাশের ঘরে ফটিক শুয়ে আছে। আর তার

পাশে বসেই শিবানী তাকে সেবা করছে। হয়তো সেবা করতে করতে চোখের জলও ফেলছে। গৌর ভট্টাচার্যি সেই বিছানায় বসে বসেই জীবনের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমস্ত জীবনটাকে পরিক্রমা করতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন—কত দূর এলেন তিনি। কোথায় এসে পৌঁছুলেন। শ্রীমদ্‌ভগবত গীতার সেই শ্লোকটার ভাষাও মনে পড়লো তাঁর। যদি দাস্যসি মে···। তবে কি মানুষের ভাল করার মধ্যে তাঁর কোনও স্বার্থচিন্তা লুকিয়ে ছিল ?

একবার তিনি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরোলেন। পাশের ঘরের দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে বিছানাটার দিকে নজর দিলেন। টিম টিম করে হারিকেনটা জ্বলছে। ফটিক অঘোরে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে। হয়তো জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আর তারই পাশে শিবানী বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তার খেয়ালও নেই।

গৌর ভট্টাচার্যি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর আবার নিজের ঘরে চলে এলেন। সমস্ত অন্ধকার চারদিকে। পুকুর পাড়ের তেঁতুল গাছটার মাথাটা দেখা যাচ্ছিল জানালা দিয়ে। সেদিকে দেখতে দেখতে মনে হলো, কোথায় যেন সবকিছু গোলমাল হয়ে গেছে। সবকিছুর হিসেব যেন বেহিসেব হয়ে গেছে।

আবার কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন খেয়াল নেই। হঠাৎ শিবানীর কান্নার শব্দে তাঁর জ্ঞান হলো। তিনি ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। মনে হলো বাইরে যেন কাদের গলা শুনতে পাচ্ছেন।

তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন তিনি। এসে দেখলেন বেশ কয়েকজন লোক উঠোনে এসে হাজির হয়েছে। তিনি নরেনকে চিনতে পারলেন। তাঁকে দেখেই নরেন এগিয়ে এল।

নরেনের কাছেই প্রথম খবরটা শুনলেন। বললেন—ফটিক নেই ? কই, আমি তো কিছু শুনিনি ? কোথায় গেল সে ?

পাশের ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। বিছানা ফাঁকা। সেখানে গৃহিণী চুপ করে কাপড়ের আড়ালে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদছেন। বাসন্তী, রানী, আরো দু' একজন পাড়ার মহিলাও রয়েছেন সেখানে।

—কিন্তু কখন গেল সে? আমি তো মাঝরাত্রে উঠে দেখলাম ঘুমোচ্ছে। এর মধ্যে কোথায় গেল? সে তো শুয়ে অঘোর অচৈতন্য হয়ে ছিল জ্বরে। উঠলোই বা কেমন করে? কে তাকে নিয়ে গেল? পুকুরটা দেখেছ তোমরা? পুকুরের জলে ডুবে যায়নি তো?

তারপর সেদিন, তার পরের দিন, তার পরেও আরো ক'দিন সন্ধান চললো। খবর গেল বলরামপুর থানায়। খবর গেল আশপাশের গ্রামে। আশপাশের গ্রামের লোকও এসে ভিড় করলো বাড়িতে। কোথাও নেই ফটিক, ফটিক যেন এক মুহূর্তের নাটিশে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কেউ নির্দেশ দিতে পারলে না। তারপরও আকাশে সূর্য উঠলো, তারপরও আকাশে সূর্য ডুবলো। পৃথিবী আরো কয়েকবার সূর্য প্রদক্ষিণ করলো, তবু ফটিক ফিরলো না। মেয়ের যে শেষ স্মৃতিটুকু ক্ষীণ হয়ে তখনও সংসারের প্রাত্যহিকতার মধ্যে জড়িয়ে ছিল, তাও আস্তে আস্তে হয়তো চিরকালের মতই নিষ্প্রভ হয়ে এল।

ফটিক আর ফিরলো না।

স্কুলের ছেলেরা ভেবেছিল, বাড়িতে যাঁর অত বড় বিপদ তিনি বোধ হয় আর পরদিন স্কুলে আসবেন না। অন্তত একটা দিন তাঁর রক্ত-চক্ষুর প্রহরা থেকে তারা রেহাই পাবে। কিন্তু না। প্রতিদিনের মতই তিনি কাঁধে চাদর নিয়ে নিজের ঘরের সামনে সেদিনও দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের পকেটের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলছেন—জনার্দন, গেট বন্ধ করো—

জনার্দনও প্রথমে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল।

সেও তো খবরটা শুনেছিল ভোরবেলাই। খবরটা পেয়ে সেও ছুটে গিয়েছিল পণ্ডিত মশাই-এর বাড়িতে। সেখানে তখন অনেকেই হাজির হয়েছে। সেক্রেটারিবাবুও ছিলেন। সকলেই পাথরের মত হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? কার কী প্রতিকার করবার ক্ষমতা আছে?

কিন্তু সেই পণ্ডিত মশাই-ই যে আবার তখন নিয়ম করে স্কুলে আসবেন, তা কে ভাবতে পেরেছিল!

—জনার্দন, গেট বন্ধ করো!

শশধরবাবু খবরটা বাড়িতেই শুনেছিল। একটু দেরি করে আসছিল। জনার্দনকে বললে—গেটটা খোল্ বাবা, আজকেও তোর পণ্ডিত মশাই ইস্কুলে এসেছে? ধন্যি তোর পণ্ডিত মশাই রে, ধন্যি—

কিন্তু না এলে কি চলে? নিজের নাতি না থাক, এতগুলো ছাত্র রয়েছে তাঁর। এরাও তো সব তাঁর নাতি! এরাও তো তাঁর নাতিরই মতন। এদের ভালো-মন্দও তো তাঁকেই দেখতে হবে। তিনি না দেখলে এদের কে দেখবে? কে এদের ভালো চাইবে?

নূতন করে প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছে এবার। এবার আর এ-প্রশ্নপত্র নিমাই সা'র প্রেসে ছাপা হয়নি। এবার আর কেউ প্রশ্ন-পত্র আগে থেকে জানতে পারেনি। এবার কোচিং স্কুলের কর্তাদের বড় মুশকিল হয়েছিল! কিন্তু কে পণ্ডিত মশাই-এর মুখের ওপর কথা বলবে?

নরেন চক্রবর্তী মশাই সেদিন এল হেডমাস্টারের ঘরে। বললে—টীচারদের কী রকম মতি-গতি?

ভবরঞ্জন বললে—মতি-গতি খুব ভালো নয়—

—ভালো নয় মানে?

ভবরঞ্জন বললে—মাস্টার মশাইরা শুনলাম একটা মিটিং করেছিল, এগজামিন বয়কট করতে—ওরা খুব রেগে গেছে, বলছে, আমাদের

ওপর কমিটির যখন কোনও আস্থা নেই তখন আমরাও আর পরীক্ষার সময় গার্ড দেবো না—

খবরটা শুনে প্রথম দিকে নিমাই সা' বলেছিল—খুব ভালো, তা যদি হয়, তাহলে খুবই ভালো হবে। আমি চাই এর একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাক। সত্যিই তো, পণ্ডিত মশাই এ ইস্কুলের কে? তাঁর কথাই রাখা হবে, আর কমিটি কেউ নয়? কিছু নয়?

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা খুবই জটিল হয়ে আসছিল। চারদিক থেকে খবর এল, পরীক্ষার দিন সবাই একযোগে নাকি পরীক্ষা বয়কট করবে।

নরেন চক্রবর্তী কিন্তু বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এতদিনের স্কুল, এতগুলো ছেলের ভবিষ্যৎ। আগের দিন সোজা স্কুলে এসেই শশধরবাবুকে ডেকে পাঠালে। জিজ্ঞেস করলে—কী, আপনারা নাকি পরীক্ষা বয়কট করবেন ঠিক করেছেন?

শশধরবাবু বললে—হ্যাঁ—

নরেন চক্রবর্তী বললে—কিন্তু আপনারা ইনোসেন্ট ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন? আপনাদের নিজেদের স্বার্থটাই আপনাদের কাছে বড় হলো?

শশধর বললে—তা কমিটি যখন আমাদের কথা শুনলে না, তখন আমরাই বা কেন কমিটির কথা শুনবো?

—আপনাদের কথা কমিটি শোনেনি মানে? আপনাদের পে-স্কেল বাড়ানো হয়নি? তার জন্যে মাসে সাড়ে বারো হাজার টাকা স্কুলের এক্সপেনডিচার বেড়ে গেছে, তা জানেন?

শশধরবাবু হাসতে লাগলো। আসলে মাইনের জন্যে তো আর শশধরবাবুরা চাকরি করছেন না। কে আর আজকালকার দুর্মূল্যের দিনে শুধু মাইনেটা নিয়ে খুশী হবে? মাইনে হাজার টাকা পেলেও পেট ভরে না। উপরি চাই। উপরিটায় যেন একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে। কোচিং স্কুল থেকে যেটা উপরি পাওয়া যায় তার যেন স্বাদ-গন্ধই আলাদা। একশো-দেড়শো টাকা যা আসে সেটা

যেন পড়ে পাওয়া টাকা। ওই পড়ে পাওয়া টাকাটার ওপর তাই অত লোভ শশধরবাবুদের। ইস্কুলের মাইনেটা যেন সিঁথির সিঁদুর, ওইটে সিঁথিতে লাগিয়ে তুমি এর-ওর-তার সঙ্গে রাত কাটাও, তাতে জাতও বাঁচবে, রুচিটাও বদলানো যাবে—

—আমাদের ওপর কমিটির আস্থা নেই বলেই আমাদের কোশ্চেন করতে দেওয়া হলো না।

নরেন চক্রবর্তী বললে—তা বরাবর আপনাদের ওপর আস্থা ছিল, আর এ-বছরেই হঠাৎ আস্থা চলে গেল কেন, সেইটে বিবেচনা করুন আপনারা ? আপনাদের ওপর পণ্ডিত মশাই-এর অভিযোগ, আপনারা ছাত্রদের কোশ্চেন বলে দেন।

শশধরবাবু বললে—তাহলে আমাদের আপনারা ডিসচার্জ করে দিন। যেখানে আমাদের ওপর আপনাদের সন্দেহ সেখানে আমরা কাজ করবো কী করে ? ছাত্ররাই বা আমাদের শ্রদ্ধা করবে কেন ?

নরেন চক্রবর্তী এবার একটু নরম হলো। বললে—দেখুন, উনি বুড়ো মানুষ। উনিই একদিন এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ওঁরও তো একটা সম্মান আছে। তাঁর কথারও কি একটা দাম নেই আপনাদের কাছে ?

কথাটা যেন শশধরবাবুর কাছে খুব অযৌক্তিক মনে হলো না।

বললে—ঠিক আছে, দেখি কতদূর উনি বাড়তে পারেন—

কিন্তু প্রথম পরীক্ষার দিন যে-কাণ্ডটা হলো তারপর বয়কটের প্রশ্ন উঠলেও আর কারো তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছে হলো না। আর ঠিক তার পরের দিন সেই ফটিকের নিরুদ্দেশ হওয়ার কাহিনীও যখন সবাই শুনলে তখন শশধরবাবুও বললে—আমাদের আর কিছু করতে হলো না হে, ভগবান নিজেই বুড়োকে শাস্তি দিয়ে দিলে—

রানী সেদিনের পর থেকে ঘন ঘনই আসতো।

বাসন্তী বলতো—যা, তোর দিদিমার কাছে যা, দিদিমার কাছে গিয়ে একটু গল্প কর গিয়ে—

রানী বরাবরই আসতো এ-বাড়িতে। কিন্তু সেই ফটিক চলে

যাবার পর সকাল-বিকাল যখন-তখন আসতে শুরু করে দিলে।

রানী চুল বাঁধার সরঞ্জামের বাক্সটা নিয়ে এসে বলতো—দাও দিদিমা, আমার চুলটা বেঁধে দাও—

শিবানীও যেন একটা কথা বলবার লোক পেয়ে বাঁচতো।

বলতো—তুই আসিস মা, তাই তবু একটা কথা বলবার লোক পাই রে—

রানী জিজ্ঞেস করতো—ফটিকের আর কোনও খবর পাওয়া গেল না দিদিমা ?

শিবানী বলতো—সে কি আর আসবে মা ? কত জায়গায় তো খবর দেওয়া হলো। বিনোদ পর্যন্ত চারদিকে চিঠি দিয়ে খবর নেবার চেষ্টা করে হয়রান হয়ে গেছে—তোর বাবাও কি কম চেষ্টা করেছে নাকি ?

সত্যিই অনেক চেষ্টা হয়েছে। কেউ তার কোনও খবর দিতে পারেনি। কোথায় যে গেল ছেলেটা! সেখানে কি খাচ্ছে, কে দেখছে তাকে, তারও ঠিক নেই। তার কথা মনে পড়তেই শিবানী চুপি চুপি চোখের জল ফেলতো।

হঠাৎ বাইরে যেন কার ডাক এল—দিদিমা—

অচেনা গলার ডাক। চিনতে পারলে না শিবানী। বললে—তুই একটু বোস তো মা, আমি দেখি—

বলে দরজার পেছন থেকে বললে—কে ?

—আমি বিনোদ, দিদিমা।

আর দরজা খুলে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে কোট-প্যান্ট পরা বিনোদ ঢুকলো ভেতরে। ঢুকে দিদিমার পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালো।

রানী চেয়ে দেখলে। অনেক দিন আগে এই বিনোদকে দেখেছে সে। কিন্তু এ যেন সে নয়। একেবারে বদলে গেছে চেহারাটা। রানী গায়ের কাপড়টা ভালো করে টেনে দিলে।

বিনোদের পেছনে একজন আর্দালির হাতে একটা ঝুলি ছিল। বিনোদ তাকে সেটা দাওয়ার ওপর রেখে চলে যেতে বললে।

লোকটা সাহেবকে সেলাম করে চলে গেল।

বিনোদ দাওয়ায় উঠে বসে বললে—এই ফলগুলো রেখে দাও দিদিমা, দাদুর জন্যে এনেছি—

—তুই আবার এসব আনতে গেলি কেন বাবা? তুই তো তোর দাদুকে চিনিস?

বিনোদ হাসতে লাগলো। বললে—দাদুকে আমি আর চিনি না! হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। পাশ করার পর মা একবার দাদুকে প্রণামী দিতে এসেছিল, তাই নিয়ে সে কী হুলস্থূল কাণ্ড! বাবা রে বাবা, দাদু এখনও সেই রকম আছে নাকি?

দিদিমাও হাসতে লাগলো। ঝুলিটা ভেতরে রাখতে যেতে যেতে বললে—আরো বেড়েছে সেইসব পাগলামি—

বিনোদ বললে—এবার যদি আবার হুলস্থূল কাণ্ড করেন তো আমিও কিন্তু আর এ-বাড়িতে আসবো না, তুমি সেই কথাটা দাদুকে বুঝিয়ে বলে দিও—আমি বাজিতপুরে বদলি হবার পথে বলরামপুরে নেমে পড়লুম; ভাবলুম যাই, দাদু-দিদিমার পায়ের ধুলো নিয়ে একটু পুণ্য সঞ্চয় করে আসি—তা দাদু কোথায়? এখনও সেই স্কুলে নাকি?

শিবানী বললে—তাঁর আর কী কাজ?

বিনোদ বললে—শুনলাম স্কুল নিয়ে নাকি খুব গোলমাল চলছে। মাস্টার মশাইরা নাকি ধর্মঘট-টর্মঘট করার হুমকি দিয়েছিল?

শিবানী বললে—কী জানি বাবা, কোন্‌দিন যে গণ্ডগোল ছিল না, তা তো মনে পড়ে না—

বিনোদ বললে—কেন? আমাদের সময় তো এ-রকম ছিল না।

শিবানী বললে—কী জানি বাবা, আমি তো বরাবরই দেখে আসছি ইস্কুল নিয়ে ওঁর চিরকালই অশান্তি—

তারপর রানীর দিকে চেয়ে বললে—আয়, তোর চুল বাঁধাটা শেষ করে দিই—

বলে রানীর চুল নিয়ে পড়লে দিদিমা। আগেই প্রায় সবটার

বিনুনি শেষ হয়ে গিয়েছিল। শুধু খোঁপা করাটা বাকি ছিল। কিন্তু ঐ। বিনোদের সামনে মাথা উঁচু করে বসে থাকতে রানীর কেমন যেন একটু লজ্জা করছিল।

—আমি এখন যাই দিদিমা!

শিবানী বললে—কেন, বিনোদের সামনে লজ্জা কীসের তোর? ও তো আমাদের বিনু রে—

রানী যেন আরো লজ্জায় পড়লো। তার মুখচোখ রাঙা হয়ে উঠলো।

বিনোদের দিকে চেয়ে শিবানী বললে—একে তুই চিনিস তো রে? এ সেই রানী, আমাদের নরেনের মেয়ে—

—তাই নাকি?

বিনোদ অবাক হয়ে গেছে। বললে—চিনতেই পারা যায় না আর, আগে কত ছোট ছিল দেখেছি—

—ওমা, তা বড় হবে না? দিন কি কারো জন্যে বসে থাকে রে? আমরাই বলে কত বুড়ি হয়ে গেলাম। আর তুইও তো কত বড় হয়েছিস। তোর মা বেঁচে থাকলে আজকে তোর বিয়ে দিয়ে নাতি-নাতনির মুখ দেখে কত আনন্দ করতো!

—আমাদের যা চাকরি দিদিমা, সকাল থেকে মাঝ-রাত অবধি খেটে-খুটে তবু কাজ শেষ করে উঠতে পারি না।

শিবানী বললে—তা সারাজীবন কি এমনি করে বদলি হয়ে হয়েই কাটাতে হবে নাকি রে তোদের? কোথাও একদণ্ড সুস্থির হয়ে তিষ্ঠোতে দেবে না আর?

বিনোদ হাসলো। বললে—না, এ চাকরির যে এই-ই নিয়ম দিদিমা। কেবল বন-জঙ্গল আর অজ পাড়াগাঁয়ে পাড়াগাঁয়েই আমাদের জীবন কেটে যাবে—

—তা আমাদের এই বলরামপুরে? বলরামপুরেও আসতে হবে নাকি?

বিনোদ বললে—হ্যাঁ, বলরামপুরে নয়, বীরগঞ্জে আসতে হতে

পারে। তা সে তো আমার হাতে নয়, কর্তাদের মর্জি—তাদের হুকুম হলেই তামিল করতে হবে—

হঠাৎ বাসন্তী ঢুকলো। বললে—ওমা, এতক্ষণ লাগে তোর চুল···

বলতে বলতে আর বলা হলো না। সামনে কোট-প্যান্ট পরা একজন কা'কে দেখে মাথায় একগলা ঘোমটা টেনে দিলে। দিয়ে একটু আড়ষ্ট হয়ে রইল।

শিবানী বললে—ওমা, ওকে দেখে লজ্জা করছো কেন বৌমা? ও যে আমার বিনু। বিনোদ। ওঁর ছাত্র। হাকিম হয়েছে এখন। বাজিতপুরে বদলি হয়ে যাচ্ছিল, যাবার পথে দিদিমাকে দেখতে এসেছে—

বাসন্তী এবারে যেন একটু সহজ হলো। কিন্তু মুখে কিছু কথা বেরোল না। ।বিনোদের দিকে তাকিয়ে শিবানী বললে—একে চিনতে পারবি না তুই, এ হচ্ছে রানীর মা। নরেন, আমাদের নরেন চক্রবর্তীর বউ রে—

কথাটা শুনেই বিনোদ তাড়াতাড়ি উঠোনে নেমে এসে বাসন্তীর পা ছুঁয়ে মাথায় হাত ঠেকালে।

—থাক, থাক বাবা, বেঁচে থাকো—

ততক্ষণে রানীর চুল বাঁধা শেষ হয়ে গিয়েছে। সে এতক্ষণ একপাশে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাসন্তী বললে—তাহলে আমরা চলি খুড়ীমা, আয় রানী—

বহুদিন পরে বিনোদ এসেছে। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর অনেক সাধের ছাত্র। অনেক স্বপ্নের ফলশ্রুতি। শিবানী জানতো কর্তা এ-সময়ে বাড়ি থাকলে খুব আনন্দ করতেন।

বিনোদ বললে—জানো দিদিমা, আমি যেখানে যাই সব জায়গাতে গিয়েই পণ্ডিত মশাই-এর কথা বলি। আমি সকলকে বলি যে, পণ্ডিত মশাই-এর স্নেহ না পেলে আমি জীবনে দাঁড়াতে পারতুম না। আমি আজ যা কিছু হয়েছি সবই পণ্ডিত মশাই-এর দয়ায়। আমি সকলকে সেইসব গল্প করি—

তারপর একে একে সেইসব পুরোন দিনের কথা বলতে লাগলো বিনোদ। সেই ছোটবেলার কথা, পণ্ডিত মশাই কবে কী বলেছিলেন, বকেছিলেন, কবে মেরেছিলেন, সব তার মনে আছে।

শিবানী বললে—কিন্তু তাতে ওঁর নিজের কী হলো বিনোদ? ওঁকে তো আর চায় না এখানকার কমিটির লোক। ওঁর কথা তো এখন কেউ আর শোনেও না—

বিনোদ বললে—কিন্তু গভর্মেণ্টের তরফ থেকেও ওঁর সম্বন্ধে কিছু করা হচ্ছে না তো!

শিবানী বললে—কী জানি বাবা, আমি ওসব কিছু বুঝিও না। ও-ব্যাপারে আমি কোনও কথাও বলি না।

বিনোদ বললে—এবার গিয়ে আমি একবার ওপর-মহলে কথাটা পাড়বো—

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়লো। বললে—সেই আপনার ফটিকের আর কোনও খবর পাননি দিদিমা?

শিবানী বললে—না বাবা, কত খোঁজখবর করা হলো, সে বোধহয় আর নেই।—

বিনোদ বললে—আমিও তো অনেক খোঁজ নিয়েছি, সমস্ত বাঙলা দেশের জেলায় জেলায় টেলিগ্রাম করেছিলাম। তারপর বেহার, উড়িষ্যা, আসাম, সব জায়গা থেকেই তো উত্তর এল, তাকে পাওয়া যায়নি—

শিবানী বললে—তোমার কর্তব্য তুমি করেছ বাবা, তুমি আর কী করবে?

খানিক পরে বিনোদ উঠলো। শিবানীর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ছোঁয়ালো। বললে—দেখি, পণ্ডিত মশাই বোধহয় এখনও স্কুলে আছেন, তাঁর চরণ দর্শন করে যাই।

—আবার এসো বাবা।

—নিশ্চয়ই আসবো দিদিমা। পণ্ডিত মশাই-এর ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না।

বলে বিনোদ চলে গেল।

রাত্রে গৌর ভট্টাচার্যি মশাই ফিরেই বললেন—ওগো, আমাদের বিনোদ এসেছিল, তোমার সঙ্গেও তো দেখা করে গেছে বললে। তা আমি ভাবছি কী জানো, আমার রানীর সঙ্গে আমাদের। বিনোদের বিয়ে হলে কেমন হয় বলো তো?

শিবানীর মাথাতে এটা আগে আসেনি। বললে—তুমি কথাটা পাড়লে নাকি?

পেড়েছিলাম। তা বিনোদ তো চুপ করে রইল, কিছু বললে না। তা বিয়ে দিলে সে তো আমাদেরই দিতে হবে। ওর তো আর কেউ নেই। এখন ন'শো টাকা মাইনে পাচ্ছে। খারাপটা কী? লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ছেলে। আমার রানীর সঙ্গে মানাবে না?

শিবানী বললে—তা মানাবে না কেন? কিন্তু ওর বাপ-মা আছে। তারা আগে রাজী হয় কিনা তাই দেখ—

—রাজী হবে না কেন? অমন সোনার জামাই কোথায় পাবে ওরা?

—তবু মেয়ে তো ওদের!

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—হোক ওদের মেয়ে। কিন্তু সেই হাঁসখালির রতন চৌধুরীর ছেলের চেয়ে তো হাজার গুণে ভালো। আর ওদের যেমন মেয়ে, আমারও তো তেমনি নাতনি! যাই, ওদের খবরটা দিয়ে আসি—

বলে ছাড়া জামাটা আবার গায়ে দিলেন।

বললেন—আমি এখুনি আসছি—

শিবানী বললে—তা এখুনি যাবার দরকারটা কী, কাল দিলেও তো চলবে—

গৌর ভট্টাচার্যির যখন যেটা খেয়াল হবে তখনই সেটা করা চাই। বললেন—না না, সে কী, সুসংবাদটা শিগ্রি দেওয়াই ভালো, শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কালহরণম্……আমি বৌমাকে খবরটা দিয়েই চলে আসবো—বেশি দেরি হবে না—

স্কুল নিয়ে সেইদিন থেকেই একটা গোলমাল শুরু হয়েছিল। সেই যেদিন প্রশ্নপত্র ছাপা হয়েছিল কলকাতার ছাপাখানায়। এ-সব ব্যাপারে গৌর ভট্টাচার্যির শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। এককালে নিজেই এসব করতেন। তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল কম, স্কুলও ছিল ছোট। কিন্তু স্কুলের ব্যাপারে উৎসাহের কোনোদিন কোনও রকম কার্পণ্য ছিল না।

কিন্তু জিনিসটা কারুরই ভালো লাগেনি। স্কুলের যত মাস্টার মশাই, সবাই একটা গোলমালের আয়োজন করছিল ভেতরে ভেতরে। ভালো লাগেনি ছাত্রদেরও। কারণ সেবার.পরীক্ষায় যা কিছু প্রশ্ন এসেছিল সবই তাদের অজানা।

ছাত্ররা এসে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করতো—স্যার, আমি কত নম্বর পেয়েছি ?

মাস্টার মশাই ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে দিচ্ছিল। বলতো—আমরা কী জানি ? পণ্ডিত মশাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর গে তোরা ?

মুশকিলটা আসলে হয়েছিল সংস্কৃত নিয়ে। এতদিন কোচিং স্কুলে প্রশ্ন বলে দেওয়া হয়েছে, তাদের গোটা বই পড়বারও তখন দরকার হতো না। সামান্য যে-ক'টা প্রশ্ন পড়িয়ে দেওয়া হতো, সেই ক'টার মধ্যে থেকেই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতো।

কিন্তু এবার আর তা নয়। এবার সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন এসেছে। এবার যে কোথা থেকে প্রশ্ন এসেছে তা কেউ বলতে পারেনি।

কমন-রুমের মধ্যে বসে শশধরবাবুর দল ঘোঁট পাকাচ্ছিল। বলাইবাবু বললে—আমাদেরই তো দোষ মশাই, আমাদের ইউনিটি নেই বলেই তো আজকে বাঙালীর এই দুর্দশা—

কালীধনবাবু বললেন—ইউনিটির কথা আর বোল না হে বলাই, চাকরি করতে এসেছি, যা বলবে মুখ বুঁজে সহ্য করে যাবো—চাকরি গেলে তখন তুমি আমাকে খাওয়াবে?

শশধরবাবু বললে—কী, চাকরি অমনি গেলেই হলো? এ-যুগে চাকরি কারো যাক দিকিনি দেখি!

কালীধনবাবু বললে—চাকরি গেলে আপনি ঠেকাবেন কী করে শুনি?

শশধরবাবু বললে—মশাই, আপনারা কাওয়ার্ড তাই ওই কথা বলেন! জানেন, অন্তত তিনশো ছেলে আমার দলে; তাদের যদি লেলিয়ে দিই তো আপনার পণ্ডিত কোথায় থাকবে শুনি? পণ্ডিত পরিবার নিয়ে বলরামপুরে বাস করতে পারবে? এই ইস্কুলের চেয়ার-টেবিলে আগুন জ্বালিয়ে দেবো, তবে ছাড়বো! আমাকে এখনও চেনেনি পণ্ডিত—হ্যাঁ—

বলাইবাবু বললে—আপনি আর কথা বলবেন না শশধরবাবু, আপনার ক্যারামতি বোঝা গেছে। নইলে গোড়ায় যখন কোশ্চেন সেট করবার কমিটি হলো, তখন কেন রাজী হলেন? এখন যদি সব ছেলে ফেল করে তো কোথায় থাকবে আমাদের কোচিং স্কুল?

হঠাৎ আলোচনার মধ্যেই যখন ঘণ্টা বেজে ওঠে, তখন আবার সব তর্ক-বিতর্ক বন্ধ হয়ে যায়। তর্ক বন্ধ হয় বটে, কিন্তু ক্ষোভ বন্ধ হয় না। সে ক্ষোভ বিক্ষোভ হয়ে ধোঁয়ার মত ভেতরে ভেতরে গুমরে ওঠে। মাস্টার-মহলে অসন্তোষের হাওয়া বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

কথাটা নিমাই সা'র কানে পর্যন্ত যায়। নরেন চক্রবর্তীর কাছে আসে সে ঘন ঘন।

বলে—নরেন, তুমি তো কিছু দেখছো না, ওদিকে যে মাস্টাররা ছেলে ক্ষেপাচ্ছে—

নরেন ঠিক বুঝতে পারে না। বলে—ছেলে ক্ষেপাচ্ছে মানে?

—মানে কোচিং ইস্কুলের ছেলেরা দল বেঁধে সব তৈরি হচ্ছে—কোন্‌দিন ইস্কুলে না আগুন জ্বালিয়ে দেয়—

—ইস্কুলে আগুন জ্বালিয়ে দেবে? তাহলে পুলিশে খবর দিয়ে দিই? থানায় একটা ডায়েরি করে রাখি। যা-তা একটা বললেই হলো?

নিমাই সা' বললে—সব নির্ভর করছে পণ্ডিত মশাই-এর ওপর। ওঁকে না সরালে আর চলবে না ভাই।

নরেন অবাক হয়ে যায়—পণ্ডিত মশাইকে সরাবো মানে? এখনও তো পাঁচ বছর সার্ভিস রয়েছে ওঁর। আর তা ছাড়া, ইস্কুল ছাড়ালে উনি করবেন কী? মারা যাবেন যে?

নিমাই সা' বললে—সে-কথা ভাবলে কি কাজকর্ম চলে? একটা মানুষের স্বার্থ বড়, না হাজার-হাজার ছেলের স্বার্থ বড়? কোন্‌টা তুমি চাও বলো?

স্কুলের সঙ্গে পণ্ডিত মশাই-এর বহুদিনের সম্পর্ক। নরেন চক্রবর্তীর যেন কথাটা শুনতে বড় খারাপ লাগলো। সেই পণ্ডিত মশাই, একদিন তাঁকে বলরামপুরের মানুষ কত ভয়-ভক্তি করেছে। রাস্তায় ঘাটে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তারই কুশলবার্তা নিয়েছেন। নিজের সর্বস্ব দিয়ে মানুষের ভালো করতে চেয়েছেন। ইস্কুলের এক-একটা ইঁট পণ্ডিত মশাই-এর বুকের পাঁজরার মতন। দেয়ালের গায়ে একটা অশথ গাছের চারা জন্মালে তিনি নিজে মই দিয়ে উঠে সেটা উপড়ে দিয়েছেন। বাগানের গাছগুলোর গোড়ায় জল দিয়েছেন নিজের হাতে। কত গাছের চারা পুঁতেছেন বাগানে। তাঁকে স্কুল থেকে চলে যেতে বলার কথা যেন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না নরেন চক্রবর্তী। সমস্ত দিন মাথার মধ্যে কথাটা ঘুরতে লাগলো তার।

দুপুরবেলা একবার ঘুরতে ঘুরতে ইস্কুলে গিয়ে হাজির হলো নরেন।

ভবরঞ্জন তার ঘরে বসে ছিল। নরেন জিজ্ঞেস করলে—কী সব কথা শুনছি, ভব?

ভবরঞ্জনও খুব চিন্তিত। বললে—আবহাওয়া ভাল নয়। শশধরবাবুরা ছেলে ক্ষেপাচ্ছেন—রেজাল্ট বেরোনোর জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে—

—কী রকম রেজাল্ট হবে এবার ?

—অনিমেষবাবু তো বলছিলেন খুব খারাপ। আজ-কালের মধ্যেই খাতা দিয়ে দেবে।

—আর সংস্কৃত ?

ভবরঞ্জন বললে—হায়ার ক্লাশের সংস্কৃতর খাতা তো সব পণ্ডিত মশাই নিজেই দেখছেন—

—তা অত খাতা উনি একলা দেখতে পারবেন ?

ভবরঞ্জন বললে—আমিও তো সে-কথা বলেছিলুম, কিন্তু উনি তো সে-কথা শুনলেন না। বললেন—না, এবার আমি একাই দেখবো। বড় জেদ চেপে গেছে ওঁর !

নরেন জিজ্ঞেস করলে—কেন? সব খবর ওঁর কানে গেছে নাকি ?

ভবরঞ্জন বললে—না, বোধহয় কানে যায়নি। কারণ উনি তো এখন দিন-রাত খাতা দেখছেন। আজ সেই ভোরবেলাই নাকি নিজের ঘরে এসে খাতা দেখতে বসেছেন, জনার্দন বললে। জনার্দনকে বলে দিয়েছেন কেউ যেন ওঁর ঘরে না যায়—

নরেন চক্রবর্তী বললে—কবে রেজাল্ট বেরোবে ?

ভবরঞ্জন বললে—যদি বুধবারের মধ্যে সবাই খাতা দিয়ে দেয় তো সোমবারের মধ্যেই রেজাল্ট বার করবার ইচ্ছে আছে—

নরেন চক্রবর্তী আর কিছু না বলে স্কুল থেকে বেরিয়ে আবার নিজের বাড়িতে এল। হাজার-হাজার ছাত্রের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। একদিন সামান্য একটা পাঠশালা থেকে এই হাই-স্কুল গড়ে উঠেছে। সেই ইস্কুলের সঙ্গে দিনে দিনে তারও একটা অদৃশ্য যোগসূত্র গড়ে উঠেছে।···সামনে দিয়ে সুশীল সাইকেল নিয়ে বেরোচ্ছিল।

নরেন ডাকলে—কোথায় যাচ্ছ ?

সুশীল বললে—খেলতে—

নরেন বললে—একজামিন কেমন দিয়েছিলে তুমি ?

সুশীল বললে—ভালো—

নরেন বললে—এবারও ফার্স্ট হতে পারবে তো?

সুশীল বললে—হ্যাঁ—

সুশীল নিজের রেজাল্ট সম্বন্ধে বরাবরই নিশ্চিন্ত। বরাবর সে ক্লাশে ফার্স্ট হয়েই উঠেছে। ছেলের জন্যে বাড়িতে তিনজন টিউটর রেখে দিয়েছিল নরেন। কারণ, ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নরেন চক্রবর্তীর নাতির ফার্স্ট না হলে মানায়ও না।

সন্ধ্যেবেলার দিকে বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে হাজির।

নরেন জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলে—নিমাই নামলো গাড়ি থেকে। স্কুলের প্রেসিডেন্ট নিমাই সা'। পাশে আরো একজন ভদ্রলোক। বেশ বয়েস হয়েছে। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। গিলে করা পাঞ্জাবি। কোঁচানো ধুতি। হরিণের চামড়ার চটি পায়ে।

নরেন বাইরে বেরিয়ে অভ্যর্থনা করতে এল।

—এই যে নরেন, আমি এঁকে তোমার কাছে নিয়ে এলুম।

নরেন ভদ্রলোকের দিকে উদ্দেশ করে হাত জোড় করে রইল। নিমাই বললে—চলো চলো, ঘরের ভেতরে চলো, ভেতরে বসে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—

ঘরের ভেতরে চেয়ারে বসবার পর নিমাই সা' বললে—ইনিই হচ্ছেন এখানকার পুরোন আমলের ডিসট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান গোবিন্দ চক্রবর্তীর ছেলে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ইনিও এখন এখানকার ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, আর আমাদের 'বলরামপুর বয়েজ হাই স্কুলের' সেক্রেটারি।

তারপর ভদ্রলোকের দিকে নির্দেশ করে নরেনকে বললে—আর ইনি হচ্ছেন হাঁসখালির বিখ্যাত জমিদার শ্রীরতননারায়ণ চৌধুরী—

নরেন বিনীত দৃষ্টিতে রতনবাবুর দিকে চেয়ে বললে—আজ আমার কী সৌভাগ্য!

ছুটির দিন দেখেই গৌর ভট্টাচার্যি বাজিতপুরে গিয়েছিলেন।

এ বাজিতপুর সে-বাজিতপুর নয়। নদীয়া জেলার বাজিতপুর। বিনোদ এখানে বদলি হয়েছে শুনে পুরোন একজন বন্ধু এসেছিল একদিনের ছুটিতে। আসলে মানুষ বোধহয় সঙ্গ ছাড়া বাঁচতে পারে না। নিজের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই চাকরি-জীবনে বড় হয়েছে। তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না হোক, পত্রযোগ ছিল অনেকের সঙ্গেই। সেই তাদেরই মধ্যে একজন ছিল বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ সরকার। সেও ভাল সরকারি চাকরি পেয়েছে।

বিশ্বনাথের তখন চলে যাবার সময় হয়েছিল।

বিনোদ বললে—আমার মাস্টার মশাইয়ের কথা তোর মনে থাকবে তো ভাই?

বিশ্বনাথ বললে—নিশ্চয়ই—

বিনোদ বললে—জীবনে তো অনেক মাস্টার মশাই-ই দেখেছি, কিন্তু অমন একজন লোক দেখলুম না ভাই, একটা নোটবই লিখবেন না, একটা প্রাইভেট টিউশানি করবেন না, অথচ সংসারেও যে সচ্ছলতা আছে, তাও নেই মোটেই। জিজ্ঞেস করলে বলবেন, বিদ্যা বেচতে নেই। এ-যুগেও এ-রকম মানুষ যে থাকতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতেও পারা যায় না—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—দেখ, আমার ইচ্ছে হয়, আমার মাস্টার মশাই-এর জন্যে আমি কিছু করি। আমার দেওয়া সাহায্য তিনি সজ্ঞানে কিছুতেই নেবেন না। অথচ বুঝতে পারি না, কী করলে তাঁর উপকার হয়—আজকাল তো ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট থেকে শিক্ষকদের জন্যে অনেক রকম পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে।

আজকাল তো তদবিরের যুগ। কত বাজে লোক তদবির-তদারক করে সে-সব পেয়েও যাচ্ছে। কিন্তু মাস্টার মশাই-এর মত মানুষদের জন্যে কে তদবিক-তদারক করবে? তাঁর হয়ে আমরা কিছু করতে পারি না?

বিশ্বনাথ বললে—আমি দেখবো চেষ্টা করে—যদি কিছু করতে পারি—

—চেষ্টা নয়, কিছু করতেই হবে তোকে—

বিশ্বনাথ বললে—স্কুলের কমিটি থেকে রেকমেণ্ডেশন করে না কেন ওরা?

বিনোদ বললে—কেন করবে তারা? তাতে তাদের স্বার্থ কী? স্বার্থের কথা না ভেবে কেউ কি আজকাল কারো জন্যে কিছু করে?

বিশ্বনাথ গৌর ভট্টাচার্যির নাম-ধাম ঠিকানা লিখে নিয়ে চলে গেল। তাকে ঠিক সময়ে ট্রেন ধরতে হবে।

বাড়িতে লোক বলতে মাত্র ওই বিনোদ। আর কে-ই বা থাকবে। মা'র অনেক সাধ ছিল একদিন ছেলে বড় হবে, অনেক বড় চাকরি করবে, মা'র মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু তা তো হলো না। এত বড় হয়েও তাই [illegible] মনে হয়, তার যেন কিছুই হয়নি।

হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ডাকলে—বিনোদ, অ বিনোদ—

দৌড়ে গিয়ে বিনোদ নিজেই দরজাটা খুলে দিয়েছে। এ গলা তো তার চেনা। এ তো পণ্ডিত মশাই-এর গলা।

—পণ্ডিত মশাই, আপনি?

বলে তাড়াতাড়ি পণ্ডিত মশাই-এর দুই পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—আমি তোমার কাছে এলাম বিনোদ, বাঃ, বেশ চমৎকার বাড়ি তোমার, বেশ চমৎকার—

বলে ঘরের চারদিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন। এত চমৎকার

ঘর বিনোদের। [illegible] ভালো ঘরই হবে বলে আশা করেছিলেন, কিন্তু তা যে এত ভালো তা যেন আশা করতে পারেননি তিনি।

বললেন—তোমার নাম করতেই সবাই দেখিয়ে দিলে তোমার বাড়ি। তোমার চাপরাশি তো আমাকে একেবারে ঢুকতেই দেয় না। শেষে আমার পরিচয় দিলুম। আমার সম্পর্কটা বুঝিয়ে বললুম। তা তোমার খুব নাম এখানে। জানো বিনোদ, খুব নাম তোমার—

বিনোদ বললে—আপনি বসুন পণ্ডিত মশাই; বসে বসে কথা বলুন—

গৌর ভট্টাচার্যি বসলেন। বললেন—আমি বসতে আসিনি বিনোদ, বসতে আমি আসিনি। তোমায় একটা কাজের কথা বলেই চলে যাবো, ওদিকে আমার আবার ইস্কুলের অনেক কাজ পড়ে আছে কি না! ছেলেরা সব পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের পরীক্ষার ফল বেরোবে কাল—সে অনেক কাজ—

বিনোদ বললে—সে সব করবার তো লোক অনেক আছে পণ্ডিত মশাই; হেডমাস্টার রয়েছেন, সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট রয়েছেন…

—আরে তুমিও যেমন! ইস্কুল দেখবার বেলায় কেউ নেই। কেউ কিছু দেখেও না। আজকাল সবাই যে গা ঢিলে দিয়েছে। আমি যদি কোনও দিকে না দেখি তো সব পণ্ড হয়ে যাবে যে! তোমরা যখন ছিলে তখনও একলা আমিই সব করেছি, এখন এত সব লোকজন রয়েছে, তবু সেই আমি ছাড়া আর কেউ কিছু দেখবার নেই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সব সেই একলা আমাকেই করতে হয় এখনও—

বিনোদ বললে—এখন আপনার বয়েস হয়েছে, এখন একটু বিশ্রাম নিলেই পারেন—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—আরে, বিশ্রাম তো নিতে চাই, কিন্তু কাজগুলো করবে কে বলো তো? সবাই তো কেবল টাকা-টাকা

করেই অস্থির। ইস্কুলের কীসে ভালো হবে তা যে কেউ একবারও ভাবে না।

বিনোদ বললে—এই একটু আগেই আপনার কথা আমার একজন বন্ধুকে বলছিলাম, সে ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের একজন অফিসার—

—ওসব কথা থাক বিনোদ, আমার এখন ও-সব কথা শোনবার সময় নেই। তোমাকে একটা কাজের কথা বলতে আমি এসেছিলাম।

বিনোদ বললে—আগে আপনার একটু খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে বলি, আপনি এখানে আজ থেকে যান—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না না, তোমায় বললুম না, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তোমার এখানে বসে বসে খেলে আমার কাজ চলবে? আমার খাওয়া-দাওয়া সারা, তা ছাড়া হাতের কাজ ফেলে আমি চলে এসেছি যে···যাক্‌গে, যা বলতে এসেছি বলি। তোমার বিয়ে ঠিক করেছি আমি—

—বিয়ে? বিনোদ যেন আকাশ থেকে পড়লো।

—হ্যাঁ, বিয়ে। বিয়ে তো তোমাকে করতে হবে।

—কিন্তু···

—ও কিন্তু-টিন্তু নয়। আমি আমার নিজের মেয়ের বিয়েটা ভালো করে দিইনি বিনোদ। সে-দুঃখ আমার আছে। তোমার মা নেই, তোমার বিয়েটা আমি যা-তা করে দিতে পারবো না। আমার নাতনিকে তো তুমি দেখেছো, নরেনের মেয়ে···

বিনোদ কিছু কথা বলছিল না। সে চুপ করে বসে পণ্ডিত মশাই-এর কথা শুনতে লাগলো।

গৌর ভট্টাচার্যি উঠলেন। বললেন—তাহলে ওই কথা রইলো—আমি চলি। দিন স্থির করে তোমায় জানাবো—

বিনোদ বললে—আপনি বসুন মাস্টার মশাই, আমার এখানে আপনি খাওয়া-দাওয়া করে এ-বেলাটা থেকে যান—

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তোমার এখানে একটা বেলা থাকলে আমার ইস্কুল চলবে? একটা ঘণ্টা যদি ওখানে না থাকি তো সব

লণ্ডভণ্ড করে দেবে ওরা—তা জানো—

তারপর সদরে বেরিয়ে বললেন—তাহলে তুমি কথা দিলে তো বিনোদ?

বিনোদ বললে—আপনার কথার ওপর আমি কী বলবো মাস্টার মশাই, আপনি যা করবেন তাই হবে—

গৌর ভট্টাচার্যি এর পর আর দাঁড়ালেন না। সোজা বাইরের রাস্তায় পড়লেন। যা হোক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। এবার আর তিনি ভুল করবেন না। একবার একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। তার জের এখনও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

বাজিতপুরের ইস্টিশানে টিকিট কেটে তিনি ট্রেনে উঠলেন। মানুষ এর চেয়ে আর বেশি কী চায়। নিজের হাতে মানুষ করা ছাত্র আজ এত বড় হয়েছে, এটা দেখতেও আনন্দ! জীবনে তিনি এর চেয়ে বেশি আর কী চেয়েছিলেন? একদিন সেই যে নিজের গ্রামের মাটি ত্যাগ করে এই বলরামপুরে এসেছিলেন, সে তো এই জন্যেই। এই জন্যেই তো সবকিছু বিসর্জন দিয়ে বলরামপুরের ইস্কুলটা করেছিলেন।

—প্রণাম হই পণ্ডিত মশাই!

ট্রেনের মধ্যেই কে যেন তাঁকে চিনে ফেলেছে।

—কোথায় গিয়েছিলেন?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—এই বাজিতপুরে। বাজিতপুরে আমার ছাত্র বিনোদ হাকিম হয়েছে—জানো তো? সে আমার ইস্কুলেই পড়েছে কি না। এই এতটুকু বেলা থেকে আমার কাছে ও মানুষ। ভারি মেধাবী ছাত্র ছিল। আমি তখন থেকেই বলতাম বিনোদ খুব বড় হবে।

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে বলো তো বাবা? আমি তো ঠিক তোমাকে চিনতে পারছিনে—

লোকটা বললে—আজ্ঞে, আমি বই ধরাতে গিয়েছিলাম আপনার ইস্কুলে, 'সরল উপক্রমণিকা', আপনি সে বই লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আবার এ-বছরে একবার যাবো, সে বই-এর নতুন এডিশন বেরিয়েছে।

এবার আরো খুব ভালো কাগজে ছাপা হয়েছে—

পাবলিকেশনের লোক! লোকটার দিকে ভালো করে চেয়ে গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—তোমরা বাবা বই-এর দাম একটু সস্তা কোর তো বাপু, আমাদের গাঁয়ের ছেলেরা বড় গরীব, তাদের যে কিনতে বড় অসুবিধে হয়—

তারপর বললেন—এই যে আমার ছাত্র বিনোদ, এর বিধবা মা কত গরীব ছিল জানো? ছেলের জন্যে একটা বই কেনবার পয়সা পর্যন্ত ছিল না, পরের কাছে চেয়ে-চিন্তে পড়ে তবে পাশ করেছে, ফার্স্ট হয়েছে—

বেশি কথা বলবার সময় ছিল না। তারপর বললেন—এই তারই বিয়ে ঠিক করতে গিয়েছিলাম এখন, বিয়ে হচ্ছে আমার নাতনির সঙ্গে—

কথাটা বলতেও যেন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর বুকটা দশ হাত হয়ে উঠলো। ট্রেন থেকে নেমেও সে-কথাটা মন থেকে মুছতে পারলেন না।

—এই যে পণ্ডিত মশাই, কোথায় গিয়েছিলেন?

বলরামপুরের স্টেশন-মাস্টার তাঁর সামনে এসে নমস্কার করলে।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—এই যে, কেমন আছ? এই গিয়েছিলাম বাজিতপুরে। জানো তো, আমার ছাত্র বিনোদ, সে এখন বাজিতপুরের হাকিম হয়েছে—তার বিয়ে ঠিক করে এলাম—

—বিয়ে? কার সঙ্গে?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—আমার নাতনির সঙ্গে—

—আপনার নাতনি? আপনার নাতনি কে? আপনার তো নাতি ছিল একজন, সেই ফটিক…

—আরে না না, ফটিক তো কবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এ হলো আমার নাতনি, নরেনের মেয়ে। নরেন চক্রবর্তী, আমার ইস্কুলের সেক্রেটারি—

সারা রাস্তায় কত লোককে যে এমন কৈফিয়ত দিলেন তার ঠিক

নেই। কৈফিয়ত দিতে ভালোও লাগলো তাঁর। এও কি কম আনন্দের কথা! এ কথা শুনতেও ভালো, শোনাতেও ভালো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হবো-হবো। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলতে লাগলেন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই।

নরেনের বাড়ি পেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় ফিরলেই তাঁর নিজের বাড়ি। আগে নরেনের বাড়িটা পড়ে। গৌর ভট্টাচার্যি মশাই আগে নরেনের বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

কিন্তু বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছতেই যেন কেমন একটা খটকা লাগলো। কা'র গাড়ি দাঁড়িয়ে এখানে? কেউ এসেছে নাকি? নিমাই সা'র গাড়িও দাঁড়িয়ে ছিল একদিকে। গৌর ভট্টাচার্যি একটু অবাক হয়ে গেলেন। ভেতরেও যেন অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি আলো জ্বলছে। সবগুলো আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। ঢোকবার রাস্তাটা আলোয় ভরে গেছে। চাকর-বাকর ছোটাছুটি করছে। যেন একেবারে অন্যরকম আবহাওয়া।

—মাস্টার মশাই, আপনি এসেছেন? আসুন আসুন, সবাই ভেতরে আছেন—

নরেনের বাবার আমলের চাকর বৃন্দাবন এগিয়ে এল। বৃন্দাবন যেন আজকে একটু সেজেছে। গৌর ভট্টাচার্যি কিছুই বুঝতে পারলেন না। এ-সব কীসের আয়োজন!

জিজ্ঞেস করলেন—আজ তোমাদের এখানে কীসের এত আয়োজন বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন বললে—আজ্ঞে, আজকে যে দিদিমণির পাকা দেখা—

—পাকা দেখা? বিয়ের পাকা দেখা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হাঁসখালির জমিদার বাড়ির কত্তারা দিদিমণিকে পাকা দেখতে এয়েছেন, বেস্পতিবারে বিয়ে।

গৌর ভট্টাচার্যি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মাথায় যেন তাঁর বজ্রাঘাত হলো। কই, তিনি তো আজ সকালেও কিছু জানতেন না।

বৃন্দাবন বললে—আজ্ঞে, আজ হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল।

কালকে আবার ওঁদের বাড়িতে পাকা দেখা হবে—

ওধার থেকে হঠাৎ বাসন্তীর গলা শোনা গেল—বৃন্দাবন—

বৃন্দাবন চলে যেতে যেতে বললে—যাই মা—

গৌর ভট্টাচার্যি চলে আসবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে বাসন্তী এসে পড়েছে। খুড়োমশাইকে দেখে বললে—আপনি চলে যাচ্ছেন কেন খুড়োমশাই, ভেতরে আসুন—

গৌর ভট্টাচার্যি তখন যেন একেবারে বোবা হয়ে গেছেন।

বাসন্তী বললে—হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল খুড়োমশাই, সা'মশাই ঠিক করলেন সব। তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আপনি বাড়িতে ছিলেন না, খুড়ীমাকে আমি নিজে গিয়ে বলে এসেছি।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—আমি একটু বাজিতপুরে গিয়েছিলাম—

বলে ইতঃস্তত করছিলেন। কিন্তু বোধহয় ভেতর থেকে নরেন পণ্ডিত মশাই-এর গলা শুনতে পেয়ে বাইরে এসে গেছে।

—মাস্টার মশাই!

নরেনকে দেখে যেন গৌর ভট্টাচার্যির সংবিৎ ফিরে এল। বললেন—আমি ঠিক জানতাম না নরেন, আমি ঠিক···আমি বাজিতপুরে···

নরেন বললে—আসুন মাস্টার মশাই, আপনি রানীকে আশীর্বাদ করে যান—

গৌর ভট্টাচার্যির মনে হলো কেউ যেন তাঁকে ধরে চাবুক মারতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কিন্তু কখন যে তিনি ঘরের ভেতরে ঢুকেছেন, তাও তাঁর খেয়াল নেই। একঘর লোক। সামনেই নিমাই সা'র চেহারাটা চোখে পড়লো। মনে হলো সে যেন অট্টহাসি হাসছে! কেমন হলো? তুমি এ বিয়ে আটকাতে পারলে পণ্ডিত? সেই ঘটকটাও এক কোণে বসে রয়েছে। আর রয়েছেন হাঁসখালির জমিদার রতননারায়ণ চৌধুরী। এক জোড়া গোঁফ নিয়ে তিনি শান্ত হয়ে বসে আছেন। তাঁর পাশে গণ্যমান্য আরো কয়েকজন লোক।

—নিন, পণ্ডিত মশাই, আপনি রানীকে আগে আশীর্বাদ করুন—

রানী তখন বেনারসীর আবরুতে নিজেকে আড়াল করে ঘরের মধ্যিখানে মাথা নিচু করে বসে আছে। সে যেন এবার মাথাটা আরো ঝুঁকে আরো নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই ধানদূর্বা নিয়ে মাথায় ঠেকালেন। মনে মনে আশীর্বাদ করলেন। তুমি সুখী হও মা, আমি তোমার সুখই চাই। যার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হোক, তুমি যেন সতীলক্ষ্মী হয়ে স্বামীর ঘর আলো করে থাকো। আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি রাজরানী হও মা—আমার অবন্তীকে আমি হারিয়েছি, তোমার মধ্যে দিয়ে যেন আমার সব সাধ পূর্ণ হয়…

হঠাৎ গৌর ভট্টাচার্যির পায়ের ওপর এক ফোঁটা গরম জল পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। দেখলেন, রানী তখন তাঁর পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করছে।

সেদিন রাতটাও কাটলো। দুঃখের রাতও তো কাটে, তাই কাটলো। নইলে অবন্তী যেদিন মারা গিয়েছিল, সে রাতটাই বা কেটেছিল কেন? ফটিক চলে যাবার পরও তো দিন-রাতগুলো কেটেছে। কেউ কি কারোর জন্যে বসে থাকে? একদিন বহুকাল আগে পণ্ডিত মশাই শিবানীকে এই বলরামপুরে এনেছিলেন। তারপর কত দুঃখে, কত আনন্দে, কত দুর্যোগে কতকাল কেটে গেছে, অথচ কাটবার তো কথা ছিল না। না কাটবারই তো কথা। কিন্তু তবু তো কেটেছে!

এই ক'দিনের মধ্যেই যেন এ-বাড়ির সঙ্গে ও-বাড়ির সমস্ত সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই ইস্কুলে চলে যাবার পর শিবানী চুপ করে

বসে বসে খানিকক্ষণ আকাশটার দিকে চেয়ে থেকে আবার চোখ নামিয়ে নেয়। আকাশটার পশ্চিমদিকে রানীদের বাড়ির ছাদটা নজরে পড়ে। নজরে পড়তেই জোর করে চোখ দুটো নামিয়ে নেয়। শম্ভুর মা এসে সংসারের কাজকর্ম সেরে দিয়ে চলে গেছে।

শম্ভুর মা বড় কথা বলে। বলে—জানো দিদিমা, কত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে রানীর, আগে বরের বাড়িতে নাকি হাতি থাকতো—

শিবানী সে-সব কথায় কান দেয় না। আপনমনে নিজের কাজ করে যায়। কিন্তু শম্ভুর মা'র কথার যেন বিরাম নেই। সে-ই নানান খবর দিয়ে যায় সকালে-বিকেলে। সেই পাকা-দেখার দিন থেকেই শুরু হয়েছে তার খবর দেওয়া। পাত্র পক্ষ কত বড় হীরের নেকলেস দিয়েছে কনেকে। কী-কী খাইয়েছে, রাজভোগগুলো কত বড় বড় তাও হাতের মাপ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। রানীর বিয়ের কথা ছাড়া তার মুখে যেন আর অন্য কোনও কথা নেই। এক-একদিন এক-একটা খবর নিয়ে এসে চমকে দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু বাসন্তীকেও দোষ দেওয়া যায় না তা বলে।

পাকা দেখার দিন দুপুরবেলাও এসেছিল সে।

এসেই বললে—হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল খুড়ীমা, কী যে হবে বুঝতে পারছি না, তোমাকে নিজে গিয়ে সব যোগাড়-যন্তর করে দিয়ে আসতে হবে কিন্তু, একলা আমার বড় ভয় করছে—যাবে তো ঠিক ?

তারপরে জিজ্ঞেস করলে—খুড়োমশাই ? খুড়োমশাই কোথায় ? তিনি বুঝি ইস্কুলে ?

শিবানী বললে—না, তিনি গেছেন বাজিতপুরে—

তখন আর বাসন্তীর কথা বলবার বেশি সময় ছিল না। যাবার সময় বলে গেল—রানী কিন্তু পইপই করে তোমাকে যেতে বলে দিয়েছে খুড়ীমা, তুমি না গেলে কিন্তু সে খুব রাগ করবে—

রাগ! রাগের কথা শুনে শিবানীর হাসি এল। বাসন্তী চলে যাবার পর থেকেই কথাটা মনের মধ্যে ঘুরছিল। রাগ করে যেন

কেউ কারো কিছু মহা ক্ষতি করতে পারে। সংসারে কে রাগের দাম দিলে এ পর্যন্ত? সবাই তো পেছনে ফেলে চলে যায়। রাগ করে কেউ কি কাউকে ধরে রাখতে পারে। না ধরে রাখা উচিত। অবন্তীকেই কি আটকে রাখা গেল? না ফটিককেই পারা গেল ধরে রাখতে?

শেষকালে যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন শিবানী বলে—তুমি থামো তো শম্ভুর মা, সারাক্ষণ এক কথা শুনতে ভালো লাগে না—

শম্ভুর মা সারাক্ষণ থাকেই না তো সারাক্ষণ কথা বলবে কী? সে চলে যায় নিজের কাজে। তখন আরো খারাপ লাগে শিবানীর। তখন মনে হয় শম্ভুর মা আরো কথা বললে যেন ভালো লাগতো।

সেদিন হঠাৎ দুপুরবেলা দরজার কড়া নড়ে উঠেছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়েছে শিবানী। দরজার ভেতর থেকে বললে —কে রে? রানী?

রানী চুপি চুপি এসেছে নিশ্চয়। পাকা দেখার পর আর বাইরে বেরোবার নিয়ম নেই। কেন মিছিমিছি সে আসতে গেল এমন করে?

হয়তো রাগ করেছে খুব। এসেই খোঁটা দেবে—তুমি গেলে না কেন দিদিমা?

কিন্তু না, রানী নয়, সুশীল। সুশীলের গলার শব্দ এল বাইরে থেকে—দিদিমা, আমি সুশীল—

শিবানী তাড়াতাড়ি খিলটা খুলে দিলে।

—কী রে? তুই যে?

সুশীল বললে—তুমি আমাদের বাড়ি গেলে না যে দিদিমা? দিদির যে পাকা দেখা হলো, বেস্পতিবারে বিয়ে।

শিবানী শুধু বললে—রানী ভালো আছে তো?

সুশীল বললে—দিদি কিন্তু খুব রাগ করেছে তোমার ওপর, জানো দিদিমা। দিদি তো আসতো, কিন্তু মা দিদিকে আসতে দেয় না, বলে —এখন বাড়ি থেকে বেরোতে নেই—

শিবানী বললে—না, এখন না বেরোনই ভালো—তা তুই কি

সেই কথা বলতেই এলি নাকি ?

সুশীল বললে—না, ফটিকের একটা চিঠি এসেছে—

ফটিক ! বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো শিবানীর। ফটিক চিঠি দিয়েছে ? সে বেঁচে আছে ?

সুশীল চিঠিটা দেখালে হাত বাড়িয়ে।

শিবানী যদি পড়তে পারবে তাহলে কী আর ভাবনা ? বললে—কী লিখেছে রে ?

সুশীল চিঠিটার দিকে চোখ রেখে বললে—লিখেছে, এখন সে জোড়হাটে আছে, জোড়হাট থেকে শিবসাগরে যাবে যাত্রার দলের সঙ্গে। তিন শো টাকা মাইনে হয়েছে, খুব ভালো আছে সে। তার জন্যে তোমাদের ভাবতে বারণ করে দিয়েছে—

—সে এখানে কবে ফিরবে ?

সুশীল বললে—আর কোনও দিন ফিরবে না লিখেছে। লিখেছে, দাদু আমাকে কেবল মারতো, আর আমি দাদুর বাড়িতে যাবো না—

—ফিরবে না আর ?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছিল সুশীল। বললে—যাই দিদিমা, মা আবার খুব বকবে আমাকে—

শিবানী বললে—কেন ? বকবে কেন ? আমাদের বাড়িতে এসেছিস বলে ?

সুশীল বললে—না, তার জন্যে নয়, আমি যে সংস্কৃতে ফেল করেছি। দাদু আমাকে ফেল করিয়ে দিয়েছে দু' নম্বরের জন্যে··· আমাদের ইস্কুলের সব ছেলে এবার ফেল করেছে—খুব হইচই হচ্ছে ইস্কুলে সেই জন্যে—

বলে সুশীল চলে গেল। শিবানী খানিকক্ষণ দরজার পাল্লা দুটো ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রানীদের বাড়িটা নজরে পড়তেই পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে পড়লো।

স্কুলে তখন সত্যিই একটা হইচই শুরু হয়ে গেছে। সকাল থেকে শুরু হয় গার্জেনদের ভিড়। তারা তদবির শুরু করে দিয়েছে। হেড-মাস্টারের কাছে গিয়ে সবাই বলে—একী হলো হেডমাস্টার মশাই, আমার ছেলে কেন ফেল করলো? আমার ছেলে তো বরাবর ভালো রেজাল্ট করে?

ভবরঞ্জন বলে—দেখুন, আপনারা যদি খাতা দেখতে চান তো খাতা দেখুন, যে ছেলে ভালো উত্তর লিখেছে তাকে আমরা ফেল করাতে পারি না।

সে এক অস্বাভাবিক কাণ্ড শুরু হয়ে গেল স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে। শশধরবাবু টীচার্সদের কমন-রুমের ভেতরে চিৎকার করে ওঠে—এই অরাজকতার প্রতিকার চাই আমরা। আমাদের ওপর যখন কর্তৃপক্ষের আর আস্থা নেই তখন আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এর প্রতিরোধ করবো। আমাদের সংকল্প সিদ্ধ করবার জন্যে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আসুন, আমরা সকলে মিলে এর প্রতিকার দাবি করি—

হাত-পা ছুঁড়ে শশধরবাবু যেন উন্মাদের মত ছটফট করতে লাগলো।

বলাইবাবু বললে—আমাদের জব্দ করতে চাইছে পণ্ডিত মশাই, দেখবো কেমন করে আমাদের জব্দ করে—আমরাও দেখে নিতে জানি—

প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকই উত্তেজিত। অন্যদিন ঘণ্টা বাজবার পরেই যে-যার ক্লাশে যাবার তোড়জোড় করে। কিন্তু সেদিন যেন সেদিকে কারোরই খেয়াল ছিল না। সবাই নিজের নিজের কথা বলতে ব্যস্ত। সকলেরই গলা সপ্তমে চড়া।

কালীধনবাবু বললে—জানেন, সেক্রেটারির ছেলেকে পর্যন্ত দু' নম্বরের জন্যে ফেল করিয়ে দিয়েছে পণ্ডিত মশাই—

ভবরঞ্জনের ঘরেও আওয়াজটা গিয়ে পৌঁছলো। বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলে—গণ্ডগোল হচ্ছে কীসের রে?

বেয়ারা বললে—আজ্ঞে, মাস্টার মশাইদের ঘরে—

—কেন? মাস্টার মশাইরা গোলমাল করছেন কেন?

ক্লাশের ঘণ্টা বাজবার পরেও কোনও মাস্টার মশাই-এর দেখা নেই। ছাত্ররাও চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। কেউ শিষ দিচ্ছে, কেউ বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করেছে। যে-ক'জন অভিভাবক এসেছিল তারাও অবাক।

তারা হরলালের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ ধরে।

বলে—কই, হরলালবাবু, মাইনে নিন—

হরলাল বলে—আপনার ছেলের মার্কশীট নিয়ে আসুন আগে, তবে তো মাইনে নেব। মার্কশীট না দেখালে মাইনে নেবার অর্ডার নেই—

—মার্কশীট কোথায় পাবো?

—হেডমাস্টার মশাইকে গিয়ে বলুন। আমি কিছু জানি না।

জনার্দন পণ্ডিত মশাইকে গিয়ে ডাকলে। বললে—পণ্ডিত মশাই, আপনাকে হেডমাস্টার মশাই একবার ডাকছেন।

গৌর ভট্টাচার্যির যেন এতক্ষণে খেয়াল হলো। চারদিকের গোলমালের আওয়াজ কানে এল। বললে—ও কীসের শব্দ রে জনার্দন?

জনার্দন বললে—মাস্টার মশাইরা সবাই গোলমাল করছেন।

—কেন?

—কেউ কেলাশে যাচ্ছেন না। বলছেন ধর্মঘট করবেন।

—কেন? হয়েছে কী?

জনার্দন বললে—অনেক ছেলে ফেল করেছে যে। কোচিন-ইস্কুলের বদনাম হয়েছে—

—তাই নাকি ?

আর থাকতে পারলেন না গৌর ভট্টাচার্যি। ভবরঞ্জনের ঘরে যাবার পথে কমন-রুমের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

—থামুন!

চিৎকার করে উঠলেন গৌর ভট্টাচার্যি মশাই।

সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে যেন বাজ ভেঙে পড়লো।—থামবো না। আপনি আগে কৈফিয়ত দিন। আমাদের ওপর আপনার আস্থা আছে কি না তার জবাব দিন!

গোলমালে কারো কথা স্পষ্ট করে শোনা গেল না। সবাই একসঙ্গে তাদের অভিযোগ জানাতে চায় গলা ফাটিয়ে। সবাই একসঙ্গে রুখে এসে দাঁড়ালো গৌর ভট্টাচার্যির সামনে।

শিবেন্দু এককোণে বসে এতক্ষণ একটা বই পড়ছিল। তার তখন ক্লাশ নেই। সে সামনে এসে বললে—করছেন কী শশধরবাবু ?

শশধরবাবু রুখে দাঁড়ালো। বললে—আপনি থামুন মশাই, আপনাকে কে সর্দারি করতে আসতে বলেছে ?

শিবেন্দু বললে—যা বলবার ভদ্রভাবে বলুন, অত চেঁচাচ্ছেন কেন ?

—বেশ করবো, চেঁচাবো। আপনার চেঁচাতে ইচ্ছে না হয়, চুপ করে বই পড়ুন বসে বসে—

কালীধনবাবুও রুখে এল শিবেন্দুর দিকে। বললে—আপনার অত ভালোমানুষি দেখাবার কী আছে মশাই ? আপনি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, চুপ করেই থাকুন না—

শিবেন্দু তবু বলতে গেল—দেখুন, কাকে কী বলছেন আপনারা বুঝতে পারছেন না, পণ্ডিত মশাই সকলের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি—

—রাখুন মশাই, অত ভক্তি ভালো নয়—

আর একজন ল্যাজ জুড়ে দিলে—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ হে—

ততক্ষণে ভবরঞ্জন এসে গেছে।

—কী হচ্ছে আপনাদের? চুপ করুন, চুপ করুন সবাই—

—কেন চুপ করবো? অন্যায়ের সামনে চুপ করা তো কাপুরুষতা। আমরা অন্যায়ের প্রতিকার চাই!

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—আমি অন্যায় করেছি? আমাকে বলছেন আপনারা? আমি জীবনে কখনও অন্যায় করিনি, অন্যায় সহ্যও করিনি, অন্যায় বরদাস্তও করিনি! আমার নাতি অন্যায় করেছিল বলে তাকেও আমি ক্ষমা করিনি! অন্যায়ের কথা আপনারা কাকে শোনাচ্ছেন? এ স্কুল কে প্রতিষ্ঠা করেছে?

—এ ইস্কুল আমাদের! আপনি কে?

ভবরঞ্জন পণ্ডিত মশাইকে বললে—আসুন মাস্টার মশাই, আপনি এখানে থাকবেন না, ওরা এখন আপনাকে অপমান করবে! চলে আসুন, আমার ঘরে চলে আসুন—

—কেন চলে আসবো? অন্যায়ের সামনে মাথা নিচু করবো?

শিবেন্দু এবার গৌর ভট্টাচার্যির সামনে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। বললে—আপনি এখান থেকে চলে যান পণ্ডিত মশাই, এরা আপনার সম্মান রাখবে না, আর আপনার অপমান সমস্ত শিক্ষা-জগতের অপমান—আপনি এখানে থাকবেন না এখন, চলে যান—

হঠাৎ নিমাই সা' এসে হাজির হলো।

নিমাই সা'কে দেখে সকলে হইহই করে উঠেছে।

—চিৎকার হচ্ছে কীসের? এটা স্কুল না হাট? আপনারা স্কুলকে হাট বানাতে চান? থামুন, চুপ করুন!

কিন্তু কোথায় শান্তি! শশধরবাবু গলাটা আরো জোরে চড়িয়ে দিলে। কেন থামবো? কেন চুপ করবো? ইস্কুলটাকে কি আপনার পৈতৃক জমিদারি পেয়েছেন?

ভবরঞ্জন আর শিবেন্দু দু'জনে তখন ঠেলে পণ্ডিত মশাইকে বাইরে নিয়ে এল। ভবরঞ্জন বললে—এই উত্তেজনার মধ্যে ওদের এখন মতি স্থির নেই। ওরা এখন রেগে গেছে। রাগ না চণ্ডাল। আপনি আমার ঘরে চলুন—

—কিন্তু আমার যে ক্লাশ রয়েছে, ভব।

ভবরঞ্জন বললে—ক্লাশে আর কোনও ছেলে নেই, ওই দেখুন, তারা সবাই ক্লাশ ছেড়ে বাইরে এসে মজা দেখছে, চিৎকার করছে—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই হঠাৎ যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন। তাঁর এত সাধের স্কুল, তাঁর নিজের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠান! চোখের সামনে তিনি যেন তাঁর নিজের সর্বনাশ দেখতে লাগলেন। এ তো তিনি ভাবেননি, এ তো তিনি কল্পনাও করতে পারেননি!

ভবরঞ্জন তখন তাঁকে তার নিজের ঘরের ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ যেন না সেখানে ঢুকতে পারে।

গৌর ভট্টাচার্যি চেয়ারে বসে হাঁফাচ্ছেন তখনও। চারদিকে ফাঁকা দৃষ্টি দিয়ে সব দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি যেন কিছুই আর দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর কানে যেন আর কোনও শব্দ আসছে না। সব যেন নিঝুম, নিথর, নির্বাক হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

ভবরঞ্জন হঠাৎ বললে—মাস্টার মশাই, আপনি সেক্রেটারির ছেলেকে দু'নম্বরের জন্যে ফেল করিয়ে দিলেন—

গৌর ভট্টাচার্যি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ভবরঞ্জনের দিকে—

সা' মশাই বলছিলেন সকলকে গ্রেস দিতে। আপনি যদি রাজী হন, তাহলে সকলে আবার ঠাণ্ডা হয়। প্রেসিডেন্ট আজ সকালে আমাকে এসে বলছিলেন। আমি বললাম—পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করবো। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

তখনও গৌর ভট্টাচার্যির মুখে কোনও জবাব নেই—

—আর তাছাড়া স্কুলের ইনকামের দিকটাও তো আমাদের দেখতে হবে। এই গ্রামেই আবার একটা স্কুল হচ্ছে শুনছি। সব ছেলে যদি ট্রান্সফার নিয়ে চলে যায়, সে দিকটাও তো ভাবতে হবে।

ভবরঞ্জন একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—কোচিং স্কুল কিছুতেই আটকানো যাবে না, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। মাস্টার মশাইদের চটিয়েও কোনও কাজ করা যাবে না। আপনাদের সময় অন্য রকম ছিল, এখন তো দিনকাল বদলাচ্ছে। এখন জিনিসপত্রের

দামও আর আগেকার মতন নেই···

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর চোখের সামনে যেন লাল-নীল নানা রংয়ের গোল গোল বেলুন ভাসতে লাগলো। মনে হলো. সব যেন নানা রকম রং-এ রঙিন হয়ে উঠলো। চারদিকটা—

—এই দেখুন না, সুশীল চক্রবর্তী প্রত্যেকবার ফার্স্ট হয়। এবার কেন খারাপ হলো? কোশ্চেন কেউ জানতে পারেনি বলে। তার ওপর আপনি সংস্কৃতটা একটু স্ট্রিক্ট করে দেখেছেন। দুটো নম্বর তো মাত্র। দু'টো নম্বর বাড়িয়ে দিলে কী এমন ক্ষতি হয়? স্কুলের পরীক্ষাটাই কি সব? এর পর সারা জীবন ধরেই তো পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। তখন তো আপনি থাকবেন না। সবাই তো আপনার মত নয়।

হঠাৎ গৌর ভট্টাচার্যির মনে হলো, তিনি যেন চেয়ারে বসে বসেই টলছেন। তিনি যেন এখনই টলে পড়ে গেলেন বলে।

তিনি চিৎকার করে উঠলেন—এক গেলাস জল দিতে পারো, ভব—

কোথা দিয়ে যে কী সব ঘটে গেল। একদিনের মধ্যেই যেন বলরামপুরের ইতিহাস দেখতে দেখতে আমূল বদলে গেল। গৌর ভট্টাচার্যিকে দেখতে কে কে এসেছিল তারও খেয়াল ছিল না তাঁর। প্রথম দিনটা তো বেঘোরেই কেটে গেল তাঁর। বীরগঞ্জ থেকে ডাক্তার এসে দেখে গেল।

বললে—একটু বিশ্রামের দরকার। একটু বিশ্রাম নিতে বলবেন ওঁকে—

শিবানী ঘোমটা টেনে রোগীর পাশে বসে ছিল। সব চুপ করে শুনে গেল শুধু। চুপ করে শোনা ছাড়া আর উপায়ই বা কী ছিল। জীবনে উনি কারো কথা শোনেননি, আর আজ শুনবেন নিজের স্ত্রীর

কথা। তা যদি হতো তবে শিবানীর জীবনের ইতিহাস অন্য রকম হতো।

যারা খবর পেয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে বাড়িতে এসে খবর নিয়ে গেল। নরেন চক্রবর্তী মেয়ের বিয়ের জন্যে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। বললে—যাবেন কিন্তু খুড়ীমা—

শিবানী বললে—যেতে তো ইচ্ছে করে, কিন্তু তুমিই বলো বাবা, এঁকে এই অবস্থায় ফেলে কী করে যাই—

—কিন্তু আপনি না গেলে রানীর খুব মন খারাপ হয়ে যাবে খুড়ীমা, তা তো জানেন।

তারপর যাবার সময় বললে—কিছু যদি দরকার-টরকার পড়ে তো আমায় খবর দেবেন আপনি, যেন লজ্জা করবেন না। আমি সময় পেলেই মাঝে মাঝে দেখতে আসবো। ডাক্তারবাবু যেমন যেমন বলেন তেমনি তেমনি চালান—

সত্যিই তখন নরেন চক্রবর্তীর বড় সময়ের অভাব। বড়লোক কুটুম। দেওয়া-থোওয়াও তেমনি করতে হবে। প্রতিটি জিনিস কলকাতা থেকে কিনে আনতে হয়। একমাত্র মেয়ে নরেন চক্রবর্তীর। বহু লোকজনকে বলতে হয়েছে। একে গাঁয়ের ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, তার ওপর কোর্টের অ্যাডভোকেট। তাছাড়া অত বড় স্কুলের সেক্রেটারি। প্রায় হাজার লোকের জন্যে আয়োজন করতে হয়েছে তাকে। বিয়ের দিন আলোয় আলো হয়ে গেল যেন সমস্ত পাড়াটা। গৌর ভট্টাচার্যির বাড়িটাও সেই আলোয় আলো হয়ে গেল। আর সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল নহবত।

অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেল গৌর ভট্টাচার্যির।

শিবানী জেগেই ছিল। জিজ্ঞেস করলে—কিছু বলবে? জল খাবে? জল তেষ্টা পেয়েছে?

গৌর ভট্টাচার্যি চাপা গলায় বললেন—নহবত বাজছে কীসের?

শিবানী বললে—ও কিছু না, তুমি ঘুমোও।

গৌর ভট্টাচার্যি আবার জিজ্ঞেস করলেন—রানীর বিয়ে বুঝি?

শিবানীর গলায় কথাটা যেন আটকে গেল। তবু অনেক কষ্টে

একটা শব্দ শুধু বেরোল—হ্যাঁ—

গৌর ভট্টাচার্যি আর কিছু বললেন না। শুধু চোখ বুজে পাশ ফিরে শুলেন। বিয়ে-বাড়ির নহবত তখনও ঢিমে তালে আকাশ-বাতাস দুলিয়ে দূর-দূরান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেজে চলেছে। দরবারি কানাড়ার পর্দাগুলো আজ যেন বড় তীক্ষ্ণ হয়ে তীরের ফলার মত বুকে এসে বিঁধছে। সে যেন মহাভারতের বনপর্বের যুধিষ্ঠিরের মত বলছে:

নাহং কর্মফলান্বেষী রাজপুত্রী চরাম্যুত।
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যাসিত্যুত···

বলছে—রাজপুত্রি, আমি কর্মফলান্বেষী হয়ে কোনও কর্ম করি না; দান করতে হয় তাই দান করি, যজ্ঞ করতে হয় তাই যজ্ঞ করি; ধর্মাচরণের বিনিময়ে যে ফল চায় সে ধর্মবণিক, ধর্ম তার কাছে পণ্যদ্রব্য। সে হীন, সে নিন্দনীয়—

গৌর ভট্টাচার্যি ঘুমের মধ্যেই যেন শ্লোকটা জপ করতে লাগলেন মনে মনে। আর শিবানী পাশে বসে তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে জেগে রইলেন সমস্ত রাত।

পরদিন পাঁচুর মা হঠাৎ এল।

বললে—খুড়ীমা, মা একবার আপনাকে ডাকছে। মেয়ে চলে যাচ্ছে, আপনি যদি সময় করে এক মিনিটের জন্যে আশীর্বাদ করতে যান—

শিবানী বললে—কর্তাকে এই অবস্থায় ফেলে কী করে যাই!

—ওই শম্ভুর মা'কে বসিয়ে যদি একটু যেতেন। রানী দিদিমণি সকাল থেকে কান্নাকাটি করছে বড়, আপনি কালকে যাননি—! একটু গিয়ে এখুনি চলে আসতেন।—

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। শম্ভুর মাকে বসিয়ে রেখে শিবানী

রাস্তায় বেরোল। কতদিন রাস্তায় বেরোয়নি শিবানী। কাছাকাছি বাড়ি, তবু যাওয়া হয়নি একদিনের জন্যে।

—ওমা, খুড়ীমা এসেছ!

বাসন্তী টানতে টানতে খুড়ীমাকে একেবারে রানীর কাছে নিয়ে গেল। অনেক মেয়েদের ভিড় সেখানে। গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি। কিন্তু শিবানীর কোনও দিকে দৃষ্টি নেই।

রানী চোখ তুলে দিদিমার দিকে চাইলে। বড় বড় ছুটো চোখের সে-দৃষ্টিতে বিস্ময় অভিমান আবেগ আনন্দ হর্ষ বিষাদ সব যেন একাকার হয়ে ঝাপসা হয়ে গেল। তার পাশেই বসে ছিল নতুন বর। সেও চোখ তুলে দেখলে।

শিবানী আঁচলের গেরো খুলে ছুটো টাকা বার করে মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলে ছু'জনকে। তারপর ঠিক যে-পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই আবার বেরিয়ে এল।

শুধু আসবার সময় কা'র একটা কথা যেন কানে এল—পণ্ডিত মশাই এখন কেমন আছেন জ্যাঠাইমা?

কে যে কথাটা জিজ্ঞেস করলে, কী রকম তার চেহারা, তাও চেয়ে দেখলে না শিবানী। শুধু বললে—ভালো—

বলে হনহন করে রাস্তাটা কোনও রকমে পার হয়ে বাড়িতে ঢুকে যেন স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরিত্রাণ পেল।

তারপর কখন রানী শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে, কখন বরযাত্রীর দল বিদায় নিয়েছে—কিছুই খবর রাখেনি শিবানী। শম্ভুর মা'ও আর বকবক করবার সুযোগ পায়নি। সে শুধু কোনও রকমে নামমাত্র সংসারের কিছু কিছু কাজ করে দিয়ে আবার বাড়ি চলে গেছে।

গৌর ভট্টাচার্যি এবার যেন একটু সুস্থ হয়েছেন। বিছানা থেকে দাওয়ায় এসে বসেন সকালে বিকেলে।

বলেন—এবার একটু ইস্কুলে যাই বড়-বৌ—

শিবানী বলে—ওমা, তুমি এই শরীর নিয়ে যাবে কী করে?

গৌর ভট্টাচার্যি বলেন—না, যাই একবার, গিয়ে দেখে আসি—

বলেন বটে, কিন্তু যাবার শক্তিও যেন পান না শরীরে। বলেন—এত দুর্বল লাগে কেন বলো তো ?

—তা দুর্বল লাগবে না ? অত খাটুনি কি তোমার সয় এখন ?

গৌর ভট্টাচার্যি মনে মনে হাসেন ! শুধু শরীরটাই দেখলে বড়-বৌ ! মনটা তো দেখলে না। দেখলে বুঝতে পারতে সেখানে আর কোনও পদার্থ নেই। তিনি যা চেয়েছিলেন, তার সবই যে উলটে গেল। যারা যারা ফেল করেছিল, তাদের অনেককেই আবার নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবই কানে এসেছে তাঁর। আবার পুকুরের মাছ ধরানো হয়েছে। সে-সব টাকাও প্রেসিডেন্টের পকেটে চলে গেছে। বিজ্ঞানের যে-সব যন্ত্রপাতি কেনার দরকার ছিল, সে-সব কিছুই কেনা হয়নি। শশধরবাবুর কোচিং ক্লাশ আবার পুরোদমেই চলছে। তাহলে কেন তিনি এতদিন এই স্কুলের জন্যে এত পরিশ্রম করেছেন, এত ভাবনা ভেবেছেন ?

সেদিন হঠাৎ ভবরঞ্জনের হাতে চিঠিটা গিয়ে পৌঁছুলো।

প্রথমটা সে বুঝতে পারেনি। পণ্ডিত মশাই কেন তাকে হঠাৎ লিখতে গেলেন। কিন্তু চিঠিটা খুলে পড়ে বড় কষ্ট হলো। বিকেল বেলা কমিটির মিটিং ছিল। সেই মিটিং-এর মধ্যেই চিঠিটা পড়ে শোনালো সকলকে।

সমস্ত সভা খানিকক্ষণের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল পণ্ডিত মশাই-এর পদত্যাগের কথা শুনে।

নিমাই সা'ই প্রথম কথা বললে। বললে—তিনি যখন অসুস্থ তখন আর আমাদের কিছু বলবার নেই। আমার মতে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়াই ভালো—

নরেন চক্রবর্তী চুপ করে ছিল। কমিটির মেম্বারদের দিকে চেয়ে নিমাই সা' বললে—কী, সুশান্তবাবু, আপনি কিছু বলছেন না যে ?

সুশান্তবাবু বরাবরই নীরব সভ্য। বললে—আপনারা যখন একমত, তখন আমারও তাই মত, তাঁকে অব্যাহতি দেওয়াই ভালো—

নরেন চক্রবর্তীর প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সকলের মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলবার সাহস হলো না তার।

পণ্ডিত মশাই বহুদিন পরে স্কুলে তাঁর নিজের ঘরটাতে এসে বসেছিলেন। শেষবারের মত তাঁর কাজকর্ম, কাগজপত্র দেখছিলেন। বহুদিনের কর্মক্ষেত্র তাঁর এই ইস্কুলটা। এই ঘরখানাতে বসেই তিনি তাঁর কর্মকাণ্ড এতদিন চালিয়ে এসেছিলেন। কাল থেকে এ-ঘরে অন্য কেউ এসে আবার বসবে। আবার অন্য কেউ এসে এখানে বসে অন্য আদর্শে তার ইস্কুল চালাবে। চলুক। তাতে যদি সত্যিই স্কুল চলে, তো চলুক। তাঁর সময় হয়েছিল, তাই তিনি চলে যাচ্ছেন! তা চলে তো একদিন যেতেই হতো। চিরকাল তো আর তিনি এ ইস্কুল চালাতে পারতেন না।

জনার্দন অনেক বার কথা বলতে এসেছিল। গৌর ভট্টাচার্যি তাকে চলে যেতে বলেছেন। সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে—

ঘর থেকে উঠে বাইরে এসে দরজাটায় চাবি লাগালেন। হঠাৎ সামনে এসে হাজির হলো শিবেন্দু।

শিবেন্দু মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারছিল না।

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—চললুম শিবেন্দু!

শিবেন্দু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। গৌর ভট্টাচার্যি আশীর্বাদ করলেন তার মাথায় হাত রেখে। বললেন—যাই শিবেন্দু—

শিবেন্দু বললে—কেন আপনি রেজিগনেশন-পত্র দিলেন পণ্ডিত মশাই?

গৌর ভট্টাচার্যি বললেন—না শিবেন্দু, আমি ভেবে দেখলাম, আমার আর এই স্কুল আঁকড়ে ধরে থাকা ঠিক নয়। আমার আদর্শের সঙ্গে তোমাদের আদর্শের সংঘাত বেধেছে। হয়তো আমারই অন্যায়, তোমরাই হয়তো ঠিক। আমি তোমাদের বিপথে চালনা করতে চাই না। তোমাদের বিজ্ঞানই হয়তো ঠিক, আমাদের আধ্যাত্মিকতার আদর্শ হয়তো এ-যুগে অচল হয়ে গেছে—আমিও তাই এখানে অচল—আমি চলি—তুমি শুধু এই চাবিটা কালকে

জনার্দনকে দিয়ে দিও—

শিবেন্দু গৌর ভট্টাচার্যি মশাই-এর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো।

বাড়ির কাছে আসতেই গৌর ভট্টাচার্যি হঠাৎ বললেন—তুমি আর কেন আমার সঙ্গে আসছ শিবেন্দু, তুমি এবার যাও—

শিবেন্দু আর একবার পণ্ডিত মশাই-এর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল। গৌর ভট্টাচার্যি নিজের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ যেন রানীর গলা শুনতে পেলেন বাড়ির ভেতরে—

তিনি আর বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন না। তেঁতুল গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শিবানী বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছিল রানীকে দেখে।

বললে—ওমা তুই? শ্বশুরবাড়ি থেকে কবে এলি মা?

রানী বললে—এই ধুলোপায়ে বলরামপুরে এসেছি দিদিমা, আবার এখুনি চলে যাবো। শুনলাম দাদু নাকি স্কুল ছেড়ে দিয়েছে?

শিবানী বললে—হ্যাঁ মা, শরীর তো আর বইছিল না তোমার দাদুর, তাই ছেড়ে দিলেন।

রানী যেন একটু ভাবনায় পড়লো। খানিক পরে বললে—কিন্তু তাহলে দাদুর চলবে কী করে দিদিমা?

শিবানী বললে—সে-ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না আর। ভগবান যেমন করে সকলকে চালান তেমনিভাবে আমাদেরও চলবে—

রানী বললে—দিদিমা, আমার একটা কথা রাখবে?

—কী রে?

—আমি এই কিছু টাকা এনেছি দাদুর জন্যে, তুমি রেখে দাও এটা—

—টাকা? এ কা'র টাকা রে?

রানী বললে—এ অন্য কারো টাকা নয় দিদিমা, এ আমার শ্বশুরবাড়ির টাকা নয়, আমার অনেক দিনের হাত-খরচের জমানো টাকা। এ টাকায় আমার আর দরকার নেই। এটা তোমার

কাছে রেখে দাও, তোমাদের কাজে লাগবে। দাছুকে যেন বোল না, দাছুকে তো আমি চিনি। দাছু জানতে পারলে তোমাকে নিতে দিত না—তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দাও—

শিবানী হাসলো। বললে—না রে, তা হয় না। তোর দাছুকে না বলে আমি কি কিছু করতে পারি?

—কিন্তু দাছুকে বলে লাভ কী? এই বিপদের দিনে পাঁচশো টাকা তোমাদের কাজে লাগতো।

—না রে না, রানী। দাছুকে না বলে আমি কিছুই নিতে পারি না। আর দাছু তোর কাছ থেকে কিছু নেবেই না। কারো কাছ থেকেই কোনওদিন কিছু নেননি। লোকে যে-যাই বলুক, কিন্তু আমি তো জানি, অমন মানুষটাকে বলরামপুরে কেউ চিনতে পারলে না। অমন মানুষ হয় না রে—

—তা হলে কী করলে তুমি এই টাকা নেবে বলো?

—ওরে, তোকে আমাদের জন্যে আর ভাবতে হবে না। তুই স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে সুখে ঘর করবি, তাই দেখেই আমাদের সুখ। সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে মা, তোর আবার এখুনি শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে, নাতজামাই হয়তো তোর জন্যে ভাবছে, যা মা—যা—

গৌর ভট্টাচার্যি মশাই দেখলেন রানী দরজা পেরিয়ে বাইরে এল। তারপর হনহন করে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

গৌর ভট্টাচার্যি আস্তে আস্তে নিজের বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন।

পরের দিন স্কুল যথারীতি বসেছে। যেমন সূর্য ওঠে সকালে, তেমনিই সেদিনও উঠেছে। পণ্ডিত মশাই নেই। স্কুল কেমন চলছে

দেখবার জন্যে নিমাই সা' একবার স্কুলে এল। কোর্ট-ফেরত নরেন চক্রবর্তীও এসেছে। ছাত্রদের আর কোনও অভিযোগ নেই। কেউ আর তাদের ফেল করিয়ে দেবে না, দেরি করে এলেও কেউ তাদের শাস্তি দেবে না। বলরামপুর হাই স্কুলে জনার্দন সেদিন ঠিক সময়ে গেট বন্ধ করলে বটে, কিন্তু যারা দেরি করে এল, তাদের ঢুকতে দিতে হলো।

এ যেন বলরামপুর হাই স্কুলের জীবনে আবার নতুন যুগ এসে হাজির হয়েছে। এক রাজার পর আর-এক রাজার যুগ।

হঠাৎ ভবরঞ্জনের কাছে একটা সরকারি চিঠি এল। ভবরঞ্জন চিঠিটা খুলে পড়তেই কেমন অবাক হয়ে গেল যেন। দিল্লি থেকে চিঠিটা এসেছে। রাষ্ট্রপতির আগামী জন্মদিনে ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের আদর্শ শিক্ষকদের সম্মান দেখাবার জন্যে 'বলরামপুর হাই স্কুলে'র সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীযুক্ত গৌরপদ ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে। ঐ দিন রাষ্ট্রপতি একটি সম্মানপত্র ও পাঁচশত টাকা উপহার দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিবেন। সুতরাং ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে অনুরোধ করা হইতেছে। তাঁহার আসা-যাওয়ার রাহা খরচ সরকারি তহবিল হইতে···

ভবরঞ্জন চিঠিটা নিমাই সা'কে দেখালে। নিমাই সা' বললে—এ কী করে হয়? পণ্ডিত মশাই তো চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি তো তা আর পেতে পারেন না—

ভবরঞ্জন বললে—কিন্তু সা'মশাই, এ তো দেওয়া হচ্ছে শিক্ষক হিসেবে তাঁর সারা জীবনের সাধনার জন্যে—

—হলেই বা, কিন্তু এখন তো তিনি আর ইস্কুলে নেই। তিনি তো এ-ইস্কুলের আর কেউ নন—

বিকেলবেলার দিকে নরেন চক্রবত কোর্ট থেকে আসতে তাকেও ভবরঞ্জন চিঠিটা দেখালে। নরেন বললে—না না, এ চিঠি তাঁকে দেওয়া উচিত। স্কুলের তিনিই হলেন আসল ফাউণ্ডার বলতে গেলে তা ছাড়া তাঁর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাও বাকি রয়েছে—

নিমাই সা'র আপত্তি না শুনেই নরেন চক্রবর্তী বললে—আমি

নিজে যাচ্ছি তাঁর বাড়ি ; এ চিঠি তাঁকে নিজে গিয়ে দিয়ে আসছি—

বলে তখনই বেরিয়ে গেল নরেন চক্রবর্তী। যেন আর তর সইছে না তার। বহুদিনের সম্পর্ক পণ্ডিত মশাই-এর সঙ্গে। বলরামপুরের প্রত্যেকটি মানুষের মনে পণ্ডিত মশাই-এর স্মৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। পণ্ডিত মশাই-এর এই সম্মান সমস্ত বলরামপুরের মানুষের সম্মান। এ-সম্মান থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হলে বলরামপুরের মানুষরা নিজেদেরই বঞ্চিত করবে।

কিন্তু বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতেই নরেন হতবাক্ হয়ে গেল। সদর দরজায় তালা ঝুলছে! সদর দরজায় তালা কেন?

পাশের বাড়ির দরজায় গিয়ে ডাকলেন—অবিনাশবাবু, অবিনাশবাবু—

অবিনাশবাবু চিরকালই অথর্ব। বিছানায় শুয়ে থাকেন। তাঁর বড় ছেলে বেরিয়ে এল।

নরেন জিজ্ঞেস করলে—পণ্ডিত মশাই-এর বাড়িতে তালা ঝুলছে কেন হে? কোথায় গেলেন ইনি?

অবিনাশবাবুর ছেলে বললে—তিনি তো চলে গেছেন—

—কোথায় চলে গেছেন?

—আজকে ভোর পাঁচটার ট্রেনে দেশে চলে গেছেন। আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন—

ট্রেন তখন শিমুরালি স্টেশন ছাড়িয়ে গেছে। সেই ভোর পাঁচটায় বলরামপুর থেকে ট্রেনে চেপেছেন গৌর ভট্টাচার্যি। তারপর শেয়ালদায় এসে ট্রেন বদলেছেন। তারপর থেকে একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনও দিকেই যেন তাঁর খেয়াল নেই।

জানালার ধারের দিকে বসে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন পাশেই শিবানী বসে আছে। আবার তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন। সেই মোবারকপুরে। সেই কীর্তি কাব্যালঙ্কারের জন্মভূমি। একদিন বড় আশা করে তিনি বলরামপুরে এসেছিলেন—ভেবেছিলেন এখানে এসে ছেলেদের শাস্ত্র শেখাবেন, তাদের মানুষ করবেন। কিন্তু না, সেই ভাবাই বোধ হয় তাঁর ভুল হয়েছিল। মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের কথাটা মনে পড়লো—নাহং কর্মফলান্বেষী রাজপুত্রী চরাম্যুত···রাজপুত্রি, আমি কর্মফলান্বেষী হয়ে কোনও কর্ম করি না; দান করতে হয় তাই দান করি, যজ্ঞ করতে হয় তাই যজ্ঞ করি; ধর্মাচরণের বিনিময়ে যে ফল চায় সে ধর্মবণিক, ধর্ম তার কাছে পণ্যদ্রব্য!

সেদিন শিবেন্দুকে যে-কথা বলে চলে এসেছেন তাও মনে পড়তে লাগলো—আজ আমার সঙ্গে তোমাদের আদর্শের সংঘাত বেধেছে শিবেন্দু। হয়তো তোমাদের আদর্শই ঠিক, আমার আদর্শই ভুল। তোমাদের বিজ্ঞানই হয়তো মানুষকে ঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে, আমার আধ্যাত্মিকতার আদর্শ হয়তো এ যুগের পক্ষে অচল। আর তাছাড়া আমার আদর্শেই যে স্কুল চলতে হবে এমন কোনও কথা নেই; এগিয়ে চললেই হলো। তাই আমি আজ তোমাদের পথ থেকে সমস্ত বাধা দূর করে দিয়ে চলে এলাম—। আজ আমার মনে আর কোনও দুঃখ নেই। আমি আজ কামনা-বাসনা রহিত হয়েছি। আমার আর কোনও ক্ষোভ নেই কারোর ওপর। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে এই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন—যদি দাস্যসি মে···বলেছিলেন, যে লোক আপনার কাছে সাংসারিক লাভের কামনা করে সে বণিক। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত! হে বরদাতাগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আমার ঈপ্সিত বর দেন, তবে এই বর দিন, যেন আমার হৃদয়ে কখনও কোনও কামনার উদ্রেক না হয়—

মোবারকপুরের ট্রেন তখন হু-হু করে এগিয়ে চলেছে।